মাওলানা মওদূদী ও তাসাউফ

মাওলানা আবু মনযূর শায়খ আহমদ

মাওলানা মওদূদী ও তাসাওউফ

মাওলানা আবু মনযূর শায়খ আহমদ

অনুবাদ

আব্বাস আলী খান

শতাব্দী প্রকাশনী

মাওলানা মওদূদী ও তাসাওউফ

মাওলানা আবু মনযূর শায়খ আহমদ

অনুবাদ

আব্বাস আলী খান

শ. প্র : ২৮

ISBN : 978-984-645-057-6

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোন- ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : জুন ১৯৯৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৯

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা মাত্র

Maulana Maudoodi O Tasawuf By Maulana Skaikh Ahmad, Translated by Abbas Ali Khan, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone : 8311292. First Edition : June 1997, 2nd Print : October 2009.

Price Tk. 75.00 Only

সূচীপত্র

- অনুবাদকের কথা ৫
- মুখবন্ধ ৯
- ভূমিকা ১১

তাসাওউফ কি জিনিস ২৩

- তাসাওউফ ২৩
- তাসাওউফ সম্পর্কে মাওলানার দৃষ্টিভংগি ২৪
- এক নজরে হাকিম আবদুর রশীদ মাহ্‌মূদের অভিযোগ ২৭
- এক নজরে মাওলানা মনযূর নোমানীর ধারণা ও অভিযোগ ৩৩

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ৬০

- জামায়াত সম্পর্কে মাওলানা নোমানীর সুস্পষ্ট অভিমত ৬৪
- শেষ কথা ৯১

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

"মাওলানা মওদূদী ও তাসাওউফ" শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকে। গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা শায়খ আহমদ। গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ ছিল এই যে, কোন কোন আলেমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, মাওলানা মওদূদী ইল্‌মে তাসাওউফে একেবারে অজ্ঞ। তিনি এর চর্চা ত করেনই না বরঞ্চ তাঁর অনুসারীগণকেও এর থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। উপরন্তু বড়ো বড়ো আহ্‌লে তাসাওউফ ও অলীগণের বিরুদ্ধে কটুক্তিও করেন। অভিযোগ কারিগণের মধ্যে মাওলানা মন্‌যূর নোমানী একজন। অথচ তিনি সে পঁচাত্তর জনের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁদের নিয়ে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়। তিনি তখন মাওলানা মওদূদীর প্রশংসা করে বলেন, মাওলানা ইল্‌মে দীনে দূরদর্শিতা সম্পন্ন একজন মুমেন। তিনি আরও বলেন, জামায়াত প্রতিষ্ঠার সময় লাহোরে যাঁরা সমবেত হন, তাঁদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে যোগ্য পেয়েছি এবং আমরা তাঁকে (আমীর) নির্বাচিত করেছি। জামায়াতের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনারও তিনি কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছেন।

কিন্তু মাওলানা মন্‌যূর নোমানী জামায়াত প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরে ১৯৪২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার বৈঠক শেষে যে অভিযোগ করে জামায়াত থেকে বেরিয়ে যান, তা

বড়োই হাস্যকর। মাওলানার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল তাক্ওয়া পরহেযগারীর। মাওলানার লেবাস পোষাক হামেশা থাকতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঘর-দোর থাকতো তক্তকে ঝকঝকে। টেবিল-চেয়ার ছিল আধুনিক রুচিসম্মত। চিরাচরিত তাকওয়া পরহেযগারীর বিশিষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন কিছু লোক এসবকে তাক্ওয়ার খেলাপ মনে করে অপপ্রচার শুরু করেন। প্রকাশ্যে বলারও কোন সাহস ছিলনা এবং তার পেছনে কোন যুক্তিও ছিলনা। কিন্তু গোপন প্রচারণা মানুষের মনে দাগ কাটে।

ষোলজন শুরা সদস্যের মধ্যে মাওলানা মনযূর নোমানী এবং তাঁর সাথে আরও তিনজন জামায়াত থেকে বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যাওয়ার পর অপর তিনজনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। শুধু মাওলানা মনযূর নোমানী জামায়াত বিরোধী দলে শামিল হন এবং মাওলানা মওদূদীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তাঁকে ইলমে তাসাওউফ বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন যে, তাসাওউফকে তিনি দীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মনে করেননা। তাঁর এ সব অভিযোগ প্রচারের হাতিয়ার ছিল তাঁর মাসিক পত্রিকা "আল্-ফোরকান।" এভাবে তিনি তাসাওউফ পন্থীদের ক্ষিপ্ত করে তুলেন। তাঁর অভিযোগের জবাবে মাওলানা শায়খ আহমদ সাহেব উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় লাহোর থেকে প্রকাশিত 'এশিয়া' পত্রিকায় গ্রন্থখানির আগাগোড়া মূলপাঠ (Text) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। তারই বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

আমি প্রায় দুই যুগ ধরে মাওলানা মওদূদীর (র) সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পেয়ে অতি নিকট থেকে যতোটা তাঁকে দেখেছি এবং ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টি দিয়ে (Critically) দেখেছি, তাতে তাঁর মধ্যে পেয়েছি উত্তম আচার-আচরণ ও কথা বার্তা, নির্মল চরিত্র, অতি আকর্ষণীয় ব্যবহার, নির্ভীকতা, পরমুখাপেক্ষী হীনতা, সত্যের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্যে সদাপ্রস্তুতি, রুখ্সতের উপর আযীমাতকে অগ্রাধিকার দান, শাহাদতের তামান্না প্রভৃতি মহান গুণাবলী। এসব গুণাবলী এ কথারই প্রমাণ যে, সত্যিকার আল্লাহর অলীগণের যেসব গুণাবলী অনিবার্য, তার কোনটারই অভাব তাঁর মধ্যে ছিলনা।

তিনি ছিলেন অতীব নিরহংকার এক আল্লাহর বান্দাহ। কুরআন, হাদীস, তফসীর, সীরাত ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে তিনি ইলমের দরিয়া হওয়া সত্ত্বেও আলাপ চারিতায় তাঁকে মনে হতো অতি নম্র, বিনয়ী ও মাটির মানুষ। বাড়ির চাকর-বাকর, আপিসের কর্মচারী কোন অন্যায় অথবা অপছন্দনীয় কাজ করলেও কোনদিন তাদের প্রতি গালিগালাজ অথবা কটুকথা বলেননি। কখনো মিষ্টি ভাষায় কৌতুক (Humour) করে এমনভাবে কথা বলতেন যে অপরাধী ব্যক্তি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতো এবং ভুল সংশোধনে তৎপর হতো। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক এটা তিনি কিছুতেই পছন্দ করতেননা। একবার পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে পথে কয়েক স্থানে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। একথা জানতে পেরে তিনি কিছুতেই সে পথে যেতে রাজী হননি। বহুপথ ঘুরে অন্য দিক দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছেন। আমি তাঁর সফর সাথী ছিলাম।

উদ্বেগ, উৎকন্ঠা, নৈরাশ্য ও মনোবেদনাসহ তাঁর সাক্ষাৎ করলে তাঁর কথায় সব দূর হয়ে যেতো। সবর ও আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল মজবুত হতো এবং মনে এক অভূতপূর্ব প্রশান্তি অনুভূত হতো। এসব গুণাবলী তাঁর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহ হওয়ার আলামত নয় কি?

একবার এক চরম বিপদ মুহূর্তে তাঁর কর্মকুশলতায় এতোটা মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, মনে মনে কিছুটা পরীক্ষার জন্যে দেখা করে বল্লাম, মাওলানা, আপনার আজকের কর্মকুশলতা দেখে আপনাকে একজন আল্লাহ্র অলী বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। মন চাইছে যে, আপনার একবার কদমবুসি করি।

মাওলানা তক্ষুনি মলিন মুখে বল্লেন, আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ। এতো একেবারে পৌত্তলিক সংস্কৃতি। হিন্দুরা তাদের গুরুজনের পায়ের ধূলা মাথায় নেয় পাপক্ষয়ের জন্যে ও গুরুজনকে খুশী করার জন্যে। তাদের পাশাপাশি বহুকাল বসবাস করে মুসলমানরা এটি শিখেছে। এ সব চিন্তা মন থেকে দূর করে দিন।

ইলমে তাসাওউফের ময়দানে থেকে দেখেছি, মুরীদ পীরের সাথে দেখা করলেই প্রথম কাজ হবে পীরের কদমবুসি করে কিছু টাকা পয়সা নজরানা পেশ করা।

কাউকে সম্মান করে হাদিয়া তোহ্‌ফা দেয়া ইসলাম সম্মত। সে তোহ্‌ফা অর্থ নয়, কোন জিনিস। কিন্তু পীরকে দেয়া হয় টাকা, যে যতো পারে। তার সাথে কদমবুসি।

কদমবুসি করে অর্থ হাদিয়া দেয়ার দৃষ্টান্ত ইসলামের স্বর্ণ যুগে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন অথবা তার বিরোধী তাসাওউফকে মাওলানা মওদূদী (র) মেনে নিতে পারেননি, যদিও বংশানুক্রমিক তাসাওউফ চর্চাকারী ও তার শিক্ষাদাতা পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাসাওউফ বলতে যদি কুরআনের 'তায্‌কিয়া' এবং হাদীসের 'ইহসান' বুঝায়, তাহলে তিনি এর শীর্ষস্থানে ছিলেন এবং এ দুটি চর্চার তাকীদও তিনি জামায়াতের জনশক্তিকে বার বার করেছেন।

একসময় আমি স্বয়ং ক্রমাগত আট ন'বছর ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনা ও চর্চা করেছি। মাওলানা বর্ণিত ৩নং তাসাওউফের চর্চাই করছিলাম। তবে তা ত্রুটি মুক্ত পাইনি। সেজন্যে আমাকে খেলাফত দেয়া হলেও তার দায়িত্ব পালন করিনি।

আমি আশা করি, মাওলানা মওদূদী ও তাসাওউফ গ্রন্থখানি ইলমে তাসাওউফ ও মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে সহায়ক হবে।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ

আব্বাস আলী খান
(উর্দূ ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থের অনুবাদক)।

মুখবন্ধ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى مَنْ قَالَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ

এর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি আর কি হতে পারে যে, এক ব্যক্তি তাঁর মুখ ও কলম, চিন্তা ও ধারণা-বরঞ্চ গোটা জীবন একামতে দ্বীন ও কালেমায়ে হক সমুন্নত করার জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন এবং যার সাহিত্য পাঠ করে হাজার হাজার নয় বরঞ্চ লক্ষ লক্ষ যুবক নাস্তিকতা, সমাজতন্ত্র, খোদাদ্রোহীতা, দোদুল্যমানতা ও সন্দেহ সংশয়ের অন্ধকার থেকে বের হয়ে পবিত্রতা, ঈমান ও ইসলামের আলোকের দিকে ছুটে আসছে, তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় জোববা পাগড়িধারী এক ফ্রন্ট গঠন করে কুফর ও ফাসেকীর মেশিনগান থেকে গোলাগুলী বর্ষণ শুরু করেছেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লার সাথে সে আচরণই করা হচ্ছে।

মাওলানা মওদূদীকে মজলুম দেখার পর আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবিগণ নীরব থাকতে পারেননি। তাঁরা শুধুমাত্র সত্যকে তুলে ধরার জন্যে সেসব অপপ্রচার ও অভিযোগ খন্ডন করেন যা মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে করা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে "তাজাল্লী" (দেওবন্দ) পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আমের উসমানী সকলের চেয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পরে মাওলানা আবু মনযূর শায়খ আহমদের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তাসাওউফ বিশুদ্ধ তাযকিয়ায়ে নফ্‌স ব্যতীত আর কিছু নয়।

আর তার ভেতর বাইর সবটাই হতে হবে কিতাব, সুন্নাত ও শরিয়তের অধীন। তাসাওউফের নামে যে সব সন্দেহভাজন ও ভ্রান্ত বিষয় এ অধ্যাত্ম-জ্ঞানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে তা পরিত্যাজ্য। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের মুকাবেলায় অন্য কারো কথা ও কাজের কোন গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে না।

জনাব শায়খ আহমদ তাঁর প্রবন্ধে মাওলানা মওদূদীর লেখা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে এ সত্য তুলে ধরেছেন যে, মওদূদী সাহেব প্রকৃত তাসাওউফের বিরোধী ছিলেন না। 'তাসাওউফ বিল্লাহ', 'এখলাস' ও 'তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স' তাসাওউফের প্রাণশক্তি এবং মাওলানা মওদূদীর মিশনই ত এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে অধিকতর গভীর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাজ কর্মে এখলাস ও ঐকান্তিকতা সৃষ্টি হবে এবং নফ্‌সের উপর তায্‌কিয়া বিজয়ী হবে। তাঁর বর্ণনাভংগীতে রয়েছে ভাবগাম্ভির্য্য এবং চিন্তাধারায় ভারসাম্য। এ দিক দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ অতুলনীয়। কোন তিক্ততা নেই, কারো প্রতি বিদ্রুপ নেই। যুক্তি কত শক্তিশালী এবং সিদ্ধান্ত কত সুষ্ঠু ও বাস্তব। সমাধান এমন যে, প্রতিটি শব্দ হৃদয় গ্রহণ করতে থাকে। এক একটি ছত্র ও বাক্য মন মস্তিষ্কে সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দেয়। শায়খ আহমদ সাহেব এ প্রবন্ধ লিখে অসংখ্য মুখলেস মনের দোয়া পেয়েছেন এবং না জানি কত ভুল ধারণা দূর করেছেন।

মন্‌সূর হাল্লাজ 'আনাল হক' বলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন, আবুল আ'লা মওদূদী 'হুয়াল হক' বলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করা মেনে নেন। দুনিয়া সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিতাব ও সুন্নাত তাঁদের মধ্যে কার মতবাদ ও আচরণ সমর্থন করে। কে 'হককে' সন্দিগ্ধ বানিয়েছেন এবং কে তাকে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করেছেন।

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

করাচী
৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

মাহেরুল কাদেরী
সম্পাদক ফারান

ভূমিকা

তাসাওউফ শব্দটি صوف থেকে নেয়া হোক অথবা صفا থেকে, তার সম্পর্ক صفّه-এর দিকে হোক অথবা তার মূল صف হোক, অথবা আল্লামা লাত্ফীর কথায় তার সম্পর্ক গ্রীক শব্দ Theosophia-এর সাথে জড়িত হোক, মোটকথা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ পারিভাষিক শব্দ (তাসাওউফ) কুরআন হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। এমন কি হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত এর কোন উল্লেখ উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায় নি। এ জন্যে যদি ইবনে তাইমিয়া (র) এবং ইবনে হাযম (র) এর মত মনীষীগণ একে শাব্দিক বেদআতের তালিকাভুক্ত করে থাকেন, তাহলে কারো অভিযোগ করার কিছু থাকেনা। অতীতে তাসাওউফ শব্দের ব্যাখ্যায় যে সব মহৎ ধারণা ও উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থার কথাই বলা হোক না কেন তা আপন স্থানে যতোই মহান ও পবিত্র হোক, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স) এ সবের ব্যাখ্যার জন্যে অন্য শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। যেমন তাক্ওয়া, ইহসান, তায়াব্বুদ প্রভৃতি। তথাপি এ সত্যটিও উপেক্ষা করা যায় না যে, শাব্দিক বেদআত ও পরিভাষার উদ্ভাবন কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। শব্দ ও পরিভাষা তার আপন স্থানে লক্ষ্য নয়, বরঞ্চ লক্ষ্য হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত মর্ম ও অর্থ। অতএব, খ্যাতনামা, আহলুল্লাহ, সূফী ও মনীষীগণ যখন একটি পরিভাষা

উদ্ভাবন করেছেন এবং তা সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তখন আর কোন কারণ থাকতে পারে না যে তাকে শুধু 'শাব্দিক বেদআত' হওয়ার কারণে নাকচ করতে হবে। বরঞ্চ সঠিক পন্থা এ হবে যে, আমরা মাশ্‌য়েখ ও সূফীয়ায়ে কেরামের বক্তব্য থেকেই জেনে নেই যে, তাঁরা 'তাসাওউফ' বলতে কি বুঝাতে চান? কোন্ বস্তুর নাম তাঁরা তাসাওউফ রেখেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টিতে তাসাওউফের মর্ম কি? যদি তাঁরা সততা (মনের) পরিচ্ছন্নতা, এখলাস ও আখলাকের সে সব মর্মই এ শব্দের (তাসাওউফ) দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, যা কুরআন ও সুন্নাত তাক্ওয়া এবং ইহসান শব্দগুলোর দ্বারা বুঝিয়েছে তাহলে 'তাসাওউফ'কে একটি দ্বীনী পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। আর যদি এমন না হয় বরঞ্চ তার ব্যাখ্যার কোন অংশ কুরআন ও সুন্নাতের আহকাম এবং দ্বীনের স্পিরিটের পরিপন্থী হয়, তাহলে হয় তাকে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য মনে করতে হবে অথবা তার এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে দ্বীন ও শরিয়তের সাথে সংগতিশীল হয়।

এখানে একটি ঘটনা মনে পড়লো। এক ব্যক্তি তৎকালীন সূফী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) খেদমতে হাজীর হয়ে বল্লেন, আমাকে যিকির, মুরাকাবা শিক্ষা দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে আমল করেন তার ফলে আপনি ইহসানের মর্যাদা লাভ করেন কিনা? তিনি বল্লেন, হ্যাঁ লাভ করি। তারপর গাংগুহী সাহেব বলেন, আপনার কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ ইহসানের মর্যাদা অর্জন করার পর সূফীদের যিকির মুরাকাবায় মশগুল হওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, একজন গুলেস্তাঁ-বুস্তাঁ-পড়ার-পর 'কারিমা' শুরু করে।

এ ঘটনার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, তাসাওউফের নামে বিধিবদ্ধ যে সব তরিকা ও আমল আছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই ইহসানের মর্যাদা লাভ করা যার উল্লেখ হাদীসে আছে এবং যাকে আউলিয়া, মাশায়েখ, আয়েম্মা ও ওলামা বিভিন্ন

নামে অভিহিত করতে থাকেন। যদি এ মর্যাদা লাভ করা হয়ে থাকে, তাহলে তারপর তাসাওউফের কোন তরিকা অবলম্বন করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করতে পারেননা যে, কত লোক তাসাওউফের কোন তরিকা অবলম্বন ব্যতীতই ইহসানের মর্যাদা লাভ করতে থাকেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রা)। তাঁদের অবস্থা এ ছিল যে, দ্বীন ও শরিয়তের সহজ সরল ও সাধারণ হুকুমের উপর অল্প সময় আমল করার পর উচ্চমানের ইহসানের মর্যাদা লাভ করেন। বরঞ্চ কারো কারো অবস্থা এমনও দেখা যায় যে, হুযূরের (স) সংক্ষিপ্ত সাহচর্য্যই পরিপূর্ণ ইহসান অর্জন করার অসিলা হয়ে পড়ে। সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, সঠিক ধারণা পোষণকারী মুসলমানদের আকীদাহ এই যে, যিনি এক নজর হুযূরকে (স) দেখেছেন তিনি উম্মতের বড়ো বড়ো অলী ও কুতব থেকে বেশী ভালো হয়েছেন। এরও পরিষ্কার অর্থ এই যে, ঈমানের হালতে হুযূরের (স) নূর দর্শন করলেই তা ইহসানের উচ্চ মর্যাদায় পৌছে দিতে পারতো যা পরবর্তী কালের কোন বড়ো তরিকা ও আমল তা পৌছাতে পারেনা।

সাহাবায়ে কেরামের পর আয়েম্মা ও ওলামার মধ্যে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, নিয়ম মাফিক বয়আত ব্যতিরেকেই এবং তাসাওউফের কোন তরিকা অবম্বলন করা ব্যতিরেকেই তাঁরা ইহসানের স্তর অতিক্রম করে উচ্চতর মর্যাদায় পৌছে গেছেন এবং শরিয়তের সহজ ও সকলের জানা হুকুম আহকাম সহজভাবে ও সকলের জানা তরিকা অনুযায়ী আমল করে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সূফীর স্থান লাভ করেছেন যার জন্যে উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত গর্ব করতে থাকবে।

এসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ কথা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, আসল উদ্দেশ্য সত্যিকার অর্থে মুমেন হওয়া, আর মুমেন হওয়ার জন্যে, ইবাদত ও রিয়াজতের যে কোন তরিকাই অবলম্বন করা হোক না কেন, তা কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ীই হতে হবে। নফ্‌সকে

নাফরমানী থেকে বিরত রেখে ইহসানের মর্যাদা হাসিল করার জন্যে যে কোন তরিকা অবলম্বন করা হোক না কেন এবং তা যতো নেক নিয়তেই করা হোক না কেন, যদি তার কোন একটি অংশও শরিয়তের খেলাপ হয়, তাহলে তার অনিষ্টকারিতা মংগলকারিতা অপেক্ষা অবশ্যই বেশী হবে।

এখানে বিস্তারিত আলোচনার না অবকাশ আছে আর না প্রয়োজন। সকলের জ্ঞাতার্থে সূফীদের কিছু বক্তব্যই যথেষ্ট মনে করি।

ইমাম কুশায়রী (র) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রিসালায়ে কুশায় রিয়া'-তে বলেন, তাসাওউফের অর্থ হলো অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা। তার সমর্থনে একটি হাদীস পেশ করেন যাতে 'সাফা'-কে 'কুদরাত' এর বিপরীত অর্থে বলা হয়েছে। বলতে গেলে তাসাওউফ্ বলে আভ্যন্তরীণ বা নফ্সের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আর আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা (সাফায়ে বাতেন) হলো গোনাহের বদনিয়ত এবং নাফরমানীর ধূলো বালি ও ময়লা আবর্জনা দূর হয়ে যাওয়া।

আবু আলী কায্দিনী (র) বলেন, কাংখিত চরিত্রের নামই তাসাওউফ।

কাহ্তানী (র) বলেন–চরিত্রের অপর নামই তাসাওউফ। যে ব্যক্তি চারিত্রিক দিক দিয়ে তোমার থেকে অগ্রসর হয়েছে, সে তোমার থেকে 'সাফায়ে বাতেনে' অগ্রসর হলো।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী সূফীর সংজ্ঞা এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"সে (সূফী) নফ্সের দিক দিয়ে মৃত এবং হক তা'আলার মহান সত্তা তাকে জীবিত রাখে।"

তাঁর বিশেষ বর্ণনাভংগীতে সূফীর এ প্রদত্ত সংজ্ঞার বিকৃত মন মানসিকতার লোক যে কোন অর্থই করুক না কেন, হযরত জুনায়েদের মতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুমেনের দ্বীনদারী ও ইসলাম প্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের কাছে এ বিষয়ে একটুও

অস্পষ্টতা নেই, যার থেকে দ্বীন ও শরিয়তের পরিপন্থী কোন ইংগিত ইশারা আবিষ্কার করা যায়। পরিষ্কার কথা এই যে সূফী সেই ব্যক্তি যার যাবতীয় কর্ম তৎপরতা হক তা'আলার আহকামের অধীন হবে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী কোন কাজ করার ব্যাপারে তাকে মনে হবে একজন মৃত ব্যক্তির মতো। মৃত ব্যক্তি যেমন কোন কিছু করতে অক্ষম তেমনি সূফী আল্লাহর হুকুমের খেলাপ কিছু করতে অক্ষম।

কিছু লোক তাদের স্বভাবসুলভ আচরণ অনুযায়ী এ ধরনের নির্দেশাবলীর কদর্থ করে তাসাওউফের বদনাম করে। যেমন কোন কোন সমালোচক নফ্‌সের দিক দিয়ে মৃত হওয়ার অর্থ এ নিয়েছেন যে, আসল সূফী নফ্‌সের জায়েয দাবী পালন থেকেও বিরত থাকেন যার অনুমতি শরিয়ত দিয়েছে।

এ অর্থ একেবারে ভুল। এমন হলে ত একজন সূফী, একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও হিন্দু যোগীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা। অথচ রসূলুল্লাহ (স) কঠোরভাবে এর খন্ডন করেছেন। এ কি করে সম্ভব যে হযরত জুনায়েদ দ্বীন ও শরিয়তের খেলাপ কথা বলে গেছেন অথচ তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি ভালোবাসারই সাক্ষ্য দেয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

সকল পথ বন্ধ, শুধু একটি খোলা। তা সে ব্যক্তির জন্যে যে সুন্নাতে রসূলের অনুসরণ করে।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাক হিফয করেনি হাদীস লেখা পড়া করেনি–তার অনুসারী হওয়া যাবেনা। কারণ এ ইসলামের কারখানা আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নাতের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহু আকবার। তারপর যা বলেন, তাতে যারা তাসাওউফ্‌কে দ্বীন ও শরিয়ত বহির্ভূত হক ও বাতিলের এক যৌগিক বস্তু (Compound) বানিয়ে রেখেছেন তাঁদের লজ্জায় মাথা নত করা উচিত। তিনি বলেন, সে সব মহান ব্যক্তি যাঁরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী এবং যাঁদেরকে প্রথম যুগের মনীষী বলা হয়, তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন।

তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত সূফী। তাঁরাই শরিয়ত তরিকতের আমলকারী আলেম। তাঁরাই নবীগণের ওয়ারিশ। তাঁরাই রসূলুল্লাহর (স) কথা, কাজ ও চরিত্রের অনুসারী। খোদাওন্দ আলম এ সব হযরতের বরকত আমাদের দান করুন।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আদাবে নববী অবহেলাকারী এবং সুনানে মুস্তাফাবী পরিত্যাগকারী তাকে 'আরেফ' মনে করো না। দুনিয়াত্যাগ করে সংকীর্ণ হুজরায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন, বিভিন্ন কর্মকান্ডে ও কারামতে বিভোর হয়োনা এবং তাদের যুহদ, তাওয়াক্কল, মায়ারেফ তৌহীদ প্রভৃতি কথাগুলোর প্রতি আসক্ত হয়োনা। কারণ ইহুদী, নাসরানী, যোগী ও ব্রাহ্মণদের মতো বাতিল ফের্কাগুলোও এরূপ কাজে অংশ গ্রহণ করে।

অনুমান করুন হযরত জুনায়েদের (র) দৃষ্টিতে দ্বীন ও শরিয়তের কতখানি স্থান এবং তার কোন কথার এমন অর্থ বের করা যা কুরআন ও সুন্নাতের খেলাপ, তা কি করে ঠিক হতে পারে?

হযরত মা'রুফ কারখী (র) বলেন ঃ

"সৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তির শক্তির মধ্যে যা কিছু আছে সত্যজ্ঞানের মাধ্যমে তার থেকে কোন কিছুর আশা পরিত্যাগ করার নাম তাসাওউফ।"

এর মর্মের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, কামেল ঈমানের মর্যাদা ও অবস্থাকেই 'তাসাওউফ' শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। একজন কামেল মুমেনের বৈশিষ্ট্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তার সকল কাজকর্ম, গবেষণা, কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন কিছু লাভ করার কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস হবে হাকিকত (বাস্তব সত্য)। যে সত্যকে কুরআন ও সুন্নাত সত্য বলে নির্ধারিত করেছে। সে মুমেন সকল অবস্থায় খোদারই শক্তি ও কর্মশীলতার উপর নির্ভর করে সৃষ্টির শক্তিকে গুরুত্বহীন মনে করবে, সে পরোয়াই করবে না যে অমুক ব্যক্তির কাছে যেহেতু উপায় উপাদান ও পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তির প্রাচুর্য রয়েছে, লাভ লোকসানের শক্তিও তার আছে,

বরঞ্চ তার দৃষ্টিতে কারো লাভ ও ক্ষতি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। ঈমানের এ অবস্থার জীবন্ত নমুনা হুযুর (স) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল ও ভূমিকায় সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত তাওয়াক্কালের ব্যাখ্যাও তাই।

হযরত শিবলী (র) সূফীর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

"সূফী সেই যে সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং হকের সাথে সংশ্লিষ্ট।"

তাসাওউফের মর্মকথা ও সূফীদের বচনভংগী থেকে অজ্ঞ লোকেরা এ ধরনের উপদেশবাণী বুঝতে প্রতারণার শিকার হয়েছে। তারা শব্দের প্রকাশ্য দিকটা গ্রহণ করেছে এবং সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থ এ বুঝেছে যে সূফী সেই ব্যক্তি যে নির্জনবাসী হবে, দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ থেকে দূরে থাকবে। এক কথায় চুপ করে বসে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ কদর্থকারীদের চিন্তা করা উচিত যে, এভাবে তারা সূফীয়ায়ে কেরামকে দ্বীন বিরোধী বক্তব্য রাখার এবং বাতিল আকীদাহ্ পোষণ করার অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য করছেন। কারণ রাহবানিয়াত ও দুনিয়া ত্যাগকে হুযূর (স) তাঁর বক্তব্যে বাতিল বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁর বাস্তব জীবনেও তা খন্ডন করে দেন। এ জন্যে সূফিয়ায়ে কেরামের বক্তব্যের যথা সম্ভব এমন অর্থ বের করা উচিত যা কুরআন ও সুন্নাতের সাথে সংগতিশীল হয়।

অধিকাংশ সূফিয়ায়ে কেরামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে জানা যায় যে انقطاع عن الخلق-কে তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও নির্জন জীবন যাপন বা সন্নাস–জীবন (রাহবানিয়াত) অর্থে বলেননি। বরঞ্চ এ কথা বুঝিয়েছেন যে, মানুষ তার বক্ষকে আবেগ অনুভূতি, কামনা, বাসনা ও বিপদের আশংকা থেকে মুক্ত রাখবে যা নিছক পার্থিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হয় এবং যার অভ্যন্তরে খোদার রেজামন্দির চাহিদার পরিবর্তে প্রবৃত্তি ও সহজাত ধারণার নিয়ন্ত্রণ থাকে। যেমন শাহ আবদুল কাদের জিলানী (র) একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ

ভাবে বুঝিয়েছেন ! ওরে নাদান! তুমি নিজেকে পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখ। আর এ বিচ্ছিন্নতার অর্থ এ নয় যে তুমি তাদেরকে পরিত্যাগ করে নিভৃতস্থানে চলে যাবে। বরঞ্চ বিচ্ছিন্নতার অর্থ এই যে, তাদের প্রতিটি হক এটা মনে করে আদায় করবে যে, রাব্বে যুলজালাল ওয়াল একরাম তা আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। সন্তানদের প্রতিপালন, বিবির ভালোবাসা, নিকট আত্মীয়দের খেদমত, আত্মীয় বন্ধুদের আদর আপ্যায়ন এভাবে করবে যেন এসব কাজে প্রবৃত্তির স্বাদের কোন ছোয়া না লাগে। একমাত্র আল্লাহ্র হুকুম পালনই এ সব কাজে প্রেরণা সৃষ্টি করবে।

শায়খে আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রঃ) انقطاع عن الخلق এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, দুনিয়ার সকল সম্পর্ক তোমার দৃষ্টিতে যেন অতিতুচ্ছ হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভ তোমার দৃষ্টিতে যেনো হয় সবচেয়ে বড়ো। তুমি ওসব সন্তানদের ঘৃণা করবে যারা বে-দ্বীন এবং ওসব দুশমনদের ভালোবাসবে যাঁরা দীনদার।

হযরত বখতিয়ার কাকী (র) সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন (منقطع عن الخلق) সে ব্যক্তিকে মেনে নিয়েছেন যার নফ্স পার্থিব সম্পর্ক ও আবেগের ব্যাপারে এতোটা মৃত হয়ে পড়েছে যে, যদি সমগ্র দুনিয়ার ধন-দৌলত তাকে দিয়ে বলা হয়–শুধু একটা সুন্নাত থেকে বিরত থাক এবং একটা বিদআত গ্রহণ করো, তাহলে সে এ ধন-দৌলত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সুন্নাতের উপর অটল থাকবে।

এ সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সূফীয়ায়ে কেরামের বাকপদ্ধতি যেমনই হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকৃত পক্ষে তাই ছিল যা একজন সাচ্চা মুমেনের হওয়া উচিত।

মুহাম্মদ বিন আল্ কাস্সার (র) বলেন–মহৎ চরিত্রের নাম তাসাওউফ।

আবু মুহাম্মদ আল জারীবি, (র) বলেন, উৎকৃষ্ট স্বভাব চরিত্রে ভূষিত হওয়া ও মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকার নাম তাসাওউফ।

হযরত যন্নুন মিসরী (র) বলেন, সূফী তাঁদেরকে বলে যাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে সব কিছুর পর অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের মাকসুদ আল্লাহ্, মাতলুব আল্লাহ, মাহ্বুব আল্লাহ্। তাঁদের জীবন মৃত্যু, চিন্তাভাবনা, ইবাদত বন্দেগী শুধু আল্লাহ্র জন্যে। কত সংগতিশীল কুরআনের قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ কথার সাথে! হযরত আবু সালমান দারানী বলেন, বার বার আমার মনে অনেক বিষয় ও লতিফার ধারণা আসে। কিন্তু তা আমি তখনই গ্রহণ করি যখন দুটি সাক্ষী তার সত্যায়ন করে অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাত।

হযরত রুদবারী (র)-এর নিকটে এমন এক ব্যক্তির বেলায়েতের উল্লেখ করা হয় যে গান বাজনা শুনে এবং বলে এ আমার জন্যে যায়েয। কারণ আমি এমন এক উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছি যে, আমার অবস্থার সাথে মতানৈক্য করলে তা আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনা।

জবাবে হযরত রুদবারী বলেন, নিঃসন্দেহে সে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু তা হলো জাহান্নামের স্তর।

ইমাম গায্যালী (র) তাসাওউফের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ "কলংককর চরিত্র ও নিকৃষ্ট গুণাবলী থেকে পাক পবিত্র হওয়া।"

হযরত শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী বলেন, "আমরা সূফীয়ায়ে কেরাম অর্থে মুকাররাবীন (আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী) বুঝি।"

তিনি আরও বলেন, যেহেতু 'সূফী' শব্দ কুরআনে নেই, মুকাররাবীন আছে, এ জন্যে আমরা মুকাররাবই গ্রহণ করি।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর এ ব্যাখ্যা অধিকাংশ তাসাওউফ গ্রন্থে পাওয়া যায় – هٰذَا مُشَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ অর্থাৎ তাসাওউফের ব্যাপারে আমাদের যতো কিছু আকীদা ও ধারণা আছে তা কুরআন ও সুন্নাত থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে। যার প্রতি

কুরআন ও সুন্নাতের সমর্থন নেই তা কি করে তাসাওউফ হবে?

হযরত আবু ওমর নাজিদ তাসাওউফের ব্যাখ্যায় বলেন, "তাসাওউফ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর উপর অটল থাকা ও সবর করা।"

এখন অবোধ ও অজ্ঞ লোকেরা সবর বলতে বুঝেছে সকল উপায় উপকরণ থেকে মুক্ত হয়ে হাত, পা গুটিয়ে কোন নির্জন স্থানে বসে যাওয়া। এমন মনে করলে তার কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা জানেন যে, কুরআন ও হাদীসে অতি ব্যাপক অর্থে তা ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি যখন একদিকে বাতিল শক্তির শক্তিশালী সৈন্যসামন্ত এবং অপর দিকে মুজাহিদীনের যুদ্ধ উপকরণ বিহীন ক্ষুদ্র দল, তখন এ পার্থক্য উপেক্ষা করে শুধু আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে জিহাদ ও কিতাল কুরআনের ভাষায় সবর বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে উপায় উপকরণ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে যে কোন বৈধ ও সম্ভাব্য চেষ্টা তদবির করা এবং পরিণাম ফল আল্লাহ্‌রই উপর সুপর্দ করার পর যা কিছুই ঘটে তাতে অধীর না হওয়ার নাম সবর। অতএব তাসাওউফের এ সংজ্ঞাই হলো সে বস্তুর সংজ্ঞা যাকে "ঈমান" বলে।

হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়েরকে সে দেশের বাদশাহ বল্লেন, অমুক সাহেব বাতাসের সাথে উড়ে চলেন। জবাবে আবুল খায়ের বলেন, কাক এবং মাছিও ত এভাবে উড়ে চলে। বাদশাহ্ বলেন, অমুক সাহেব মুহূর্তের মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে পারেন। জবাবে তিনি বলেন, শয়তান এক নিঃশ্বাসে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে পারে।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানীর পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসূম সিরহিন্দী বলেন, তরিকত নির্ভর করে শরিয়ত মেনে চলার উপর। নাজাত নির্ভর করে রসূলের আনুগত্যের উপর এবং তার আনুগত্য ব্যতীত যুহদ ও তাওয়াক্কুল অনির্ভর যোগ্য। হুযূরের (স) বিনা অসিলায় যিকির, শোগল, উৎসাহ উদ্দীপনা সবই অর্থহীন। মা'রেফাতে ইলাহীর সাথে কাশ্‌ফ কারামতের কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী বলেন,

হুযূরের (স) পরিপূর্ণ মহব্বতের চিহ্ন এই যে, তাঁর দুশমনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং শরিয়ত বিরোধীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে। তাঁর মহব্বতে অবহেলার কোন অবকাশ নেই।

তিনি আরও বলেন শরিয়তের হুকুম পালনের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা উচিত। আহলে শরিয়ত অর্থাৎ ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। প্রবৃত্তির দাস ও বেদআত পন্থীদের হেয় করে রাখা উচিত। কারণ হুযূর (সঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَنَّ عَلٰى هَدَمَ الْاِسْلَامِ

"যে ব্যক্তি বেদআতীর প্রতি সম্মান দেখালো সে অবশ্যই ইসলামকে নির্মূল করতে সাহায্য করলো।"

কতিপয় নেকলোকের এ সামান্য বক্তব্য এ ধারণায় উধৃত করা হলো যে, অত্র প্রবন্ধ পাঠকালে পাঠকের মন যেন তাসাওউফের মর্মকথা ও মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত না হয় এবং তিনি যেন সহজেই একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, মাওলানাকে সূফী নামে আখ্যায়িত করে প্রবন্ধকার কোন ভিত্তিহীন কথা বলেননি। বস্তুতঃ তাসাওউফ ঈমানেরই সেই উচ্চ অবস্থার নাম যাকে পরবর্তীকালের লোকেরা বিকৃত করে ফেলেছে।

هٰذَا مَا عِنْدِىْ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

আমের ওসমানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাসাওউফ্ কি জিনিস

তাসাওউফ্

আমাদের দ্বীনী সাহিত্যের এ এক অতি পরিচিত নাম। কিন্তু এক ব্যক্তি তার মনে এর এক রকম অর্থ পোষণ করে এবং অন্য ব্যক্তি অন্য রকম। তারপর উভয়ে যখন এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তখন প্রত্যেকে তার নিজস্ব ধারণার আলোকেই করে থাকে। যার ফলে প্রত্যেকে অপরকে তাসাওউফ অস্বীকার কারী ও তাসাওউফ্ বিরোধী বলে গণ্য করে। তারপর এ অস্বীকার ও বিরোধীতার কারণে যে অনিবার্য তিক্ততার সৃষ্টি হয় তা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। অথচ সে বলতে থাকে, আমি তাসাওউফ অস্বীকারকারীও নই এর বিরোধীও নই। বরঞ্চ তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব এতোটা দৃঢ়তার সাথে মেনে নেই, যতোটা দৃঢ়তার সাথে তুমি পেশ করছ। জ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ কোন নতুন ও আশ্চার্যজনক বস্তু নয় যে একটি শব্দকে তার প্রাথমিক ব্যবহৃত অর্থ থেকে সরে গিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে এমন সব জটিলতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, অবশেষে পারস্পরিক বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এর সমাধানও কঠিন নয়। বিবেচ্য বিষয় এটা নয় যে, 'তাসাওউফ' শব্দটি নবী, সাহাবী ও তাবেঈনের যুগের পরে প্রচলিত হয়েছে। এর পূর্বে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায়না এবং বিবেচ্য এটাও নয় যে, এ শব্দটি صفا থেকে গৃহীত হয়েছে অথবা صوف থেকে বা صفه থেকে। দেখার বিষয় শুধু এই যে, এর সঠিক অর্থ বা সংজ্ঞা কি বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এর অর্থ কেউ এমন কিছু বলে যা কুরআন ও হাদীস সম্মত, তাহলে এ পরিভাষা কুরআন ও হাদীসের কোন্ পরিভাষার স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে তা না দেখেও এ গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। শাব্দিক বিতর্কের কোন গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। আর যদি কেউ এর

অর্থ এমন বলে যা কিছুতেই কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সংগতিশীল নয়, তাহলে তা গ্রহণ করার কোনোই কারণ থাকতে পারেনা। তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় ভ্রান্তই বলতে হবে এবং তার থেকে সম্পর্কহীন থাকতে হবে। কিন্তু আলোচনার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কে এ শব্দের কি অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং যিনিই এ শব্দের যে অর্থই গ্রহণ করেছেন তাঁকে সে মর্যাদা দেয়াই উচিত যা তাঁর প্রাপ্য।

এ এমন সহজ সরল ও যুক্তি সংগত কথা যে, এর প্রতি যদি লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিক (ইলমী) ও দ্বীনী আলোচনায় সম্ভবতঃ কোন বিতর্কই সৃষ্টি হবেনা। আর যদি হয়ও তাহলে তিক্ততা ও ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টির পর্যায়ে হয়তো পৌছবেনা। কিন্তু ব্যাপার অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অনেকে এ সব উপেক্ষা করে নিজেও চিন্তার দিক দিয়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন এবং অপরকেও বিভিন্ন ধরনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় নিক্ষেপ করে পারস্পরিক অনাস্থা-অবিশ্বাসের এক বেদনা দায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করছেন এবং প্রতিপক্ষকে কাফের ও পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করা হয়।

দূর অতীতে কেন বর্তমান যুগের মাওলানা মওদূদীর কথাই ধরা যাক। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা একজন আলেমে দ্বীন। তিনি ইলমী ও দ্বীনী বিষয়ের উপর হাজার হাজার পৃষ্ঠার সাহিত্য রচনা করে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতঃপর তাঁর এ ইলমী কাজের সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক কাজ, তাঁর আন্দোলন ও জামায়াত ইসলামী প্রতিষ্ঠা, জামায়াতের দাওয়াতী চেষ্টা চরিত্র, এ চেষ্টা চরিত্রের সুফল, এতে তাঁর নিজস্ব ভূমিকা-এ সব এমন কাজ নয় যে, তা কোন মানুষের অজানা আছে। এসব ইলমী ও আমলী কাজ দেখা ও জানার পর কেউ এ ধারণা করতে পারেনা যে, তিনি 'সূফী' নন। কিন্তু কতিপয় ধর্মীয় দলের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করা হচ্ছে যে তিনি 'তাসাওউফ' অস্বীকার করেন। এমনও বলা হচ্ছে যে দ্বীনের এ বিভাগ থেকে আকীদাহ ও আমলের দিক দিয়ে তিনি দূরে রয়েছেন। আমরা দেখাতে চাই যে, এ ব্যাপারে কে কোন্ দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেন এবং কার অবস্থান মজবুত ও সঠিক এবং কার দূর্বল ও ভ্রান্ত।

তাসাওউফ' সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিভংগী

যেহেতু মাওলানা মওদূদী দ্বীনের সকল বিভাগ ও দিক কার্যতঃ প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত করার জন্য বিগত পঁচিশ বছর যাবত সংগ্রাম করে আসছেন, এ জন্যে

তিনি তাঁর প্রবন্ধাদিতে যেমন দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগের উপর আলোকপাত করেছেন তেমনি এ বিভাগের (তাসাওউফ) উপরও তাঁর সুস্পষ্ট দৃষ্টিভংগী পেশ করেছেন। যেমন একস্থানে তিনি বলেন ঃ

তাসাওউফ কোন একটি বস্তুর নাম নয়। বরঞ্চ বহু কিছু এ নামে অভিহিত হয়েছে। যে তাসাওউফের সত্যতা আমরা স্বীকার করি তা আর এক জিনিস, যে তাসাওউফ আমরা খন্ডন করি তা এক দ্বিতীয় জিনিস। যে তাসাওউফের আমরা সংস্কার সংশোধন চাই তা এক তৃতীয় জিনিস।

এক ধরনের তাসাওউফ এমন যা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সূফীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। যেমন ফুযাইল বিন্ ইয়ায, ইবরাহীম আদহম, মা'রূপ কর্খী প্রমুখ সূফীগণ। তাঁদের কোন পৃথক দর্শন ছিল না। তাঁদের পৃথক কোন তরিকা ছিল না। সে সব চিন্তাধারা ও কাজকর্ম তাঁদের ছিল যা ছিল কিতাব ও সুন্নাত থেকে গৃহীত, আর তাঁদের সকলের সেটাই কাম্য ছিল যা ইসলামের কাম্য। অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠা ও একমুখীনতা।

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

এ তাসাওউফ আমরা সত্য বলে স্বীকার করি। শুধু এর সত্যতাই স্বীকার করিনা। বরঞ্চ একে জীবন্ত করতে ও এর প্রচার ও প্রসার চাই।

দ্বিতীয় প্রকারের তাসাওউফ এমন যার মধ্যে প্লাটোর দর্শন, গ্রীক দর্শন, যরদশ্তী ও বেদান্ত দর্শনের সংমিশ্রণ হয়েছে যার মধ্যে ঈসায়ী সন্নাসী ও হিন্দু যোগীদের কর্মপদ্ধতি শামিল হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে মুশরিকী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে শরিয়ত, তরিকত ও মা'রেফাত পৃথক পৃথক বস্তু হয়ে পড়েছে। একটি অপরটি থেকে সম্পর্কহীন বরঞ্চ অনেক সময়ে পরস্পর বিপরীত মুখী হয়ে পড়েছে। এতে মানুষকে আল্লাহ্র খলিফার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তার দ্বারা বিভিন্ন অন্য কাজের জন্য তৈরী করা হচ্ছে। এ তাসাওউফের আমরা খন্ডন করি। আমাদের নিকটে খোদার দ্বীন কায়েমের জন্যে তার উচ্ছেদ ততোটা জরুরী যেমন নতুন জাহেলিয়াত উচ্ছেদ করা।

এ দুটি তাসাওউফ ব্যতীত আর একটি তাসাওউফও আছে যার মধ্যে প্রথম ধরনের তাসাওউফ এর কিছু এবং দ্বিতীয় ধরনের তাসাওউফ এর কিছু বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রিত পাওয়া যায়। এ তাসাওউফের তরিকাসমূহ এমন সব বিভিন্ন বুযর্গানে দ্বীন রচনা করেন যারা ইলমের অধিকারী ছিলেন। নেক নিয়ত পোষণ করতেন। কিন্তু আপন যুগের বৈশিষ্ট্য ও পূর্ববর্তীযুগের প্রতিক্রিয়া থেকে একেবারে নিরাপদ

বা সংরক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের প্রকৃত তাসাওউফ উপলব্ধি করার এবং তার কর্মপদ্ধতি জাহেলী তাসাওউফের মলিনতা থেকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিভংগীতে কিছু না কিছু প্রভাব জাহেলী তাসাওউফ দর্শনের এবং তাদের আমলে কিছু না কিছু প্রভাব বাইর থেকে গৃহীত আমল কর্মপদ্ধতির অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। এ সবের ব্যাপারে তাঁদের মনে এ খট্‌কা ছিল যে, হয়তো এসব কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় অথবা অন্তত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা ত অসাংঘর্ষিক মনে করা যায়। উপরন্ত এ তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও ফলাফলও ইসলামের উদ্দেশ্য ও তার কাংখিত ফলাফল থেকে কম বেশী ভিন্নতর। না তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী করা এবং এমন বানানো যা কুরআন। لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ শব্দাবলীর দ্বারা বলে দিয়েছে। আর না তার ফলাফল এ হয়েছে যে তার মাধ্যমে এমন লোক তৈরী হতে পারতো যারা দ্বীনের পূর্ণ ধারণা হৃদয়ংগম করতে পারতো এবং তা প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা তাদের মনে জাগতো এবং কাজ করার যোগ্যতাও রাখতো। এ তৃতীয় প্রকারের তাসাওউফের না আমরা পুরোপুরি সত্যায়ন করি আর না পুরোপুরি খন্ডন করি বরঞ্চ তার অনুসারী অনুগামীদের কাছে আমাদের আবেদন এই যে, মেহেরবানী করে মহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা যথাস্থানে রেখে এ তাসাওউফের প্রতি কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং তা সংশোধন করার চেষ্টা করুন। যদি কেউ এ কারণে এ তাসাওউফের সাথে দ্বিমত পোষণ করে যে সে তা কিতাব ও সুন্নাতের পরিপন্থী পেয়েছে, তাহলে তার সাথে একমত হন বা না হন তার সমালোচনার অধিকার অস্বীকার করবেননা এবং তাকে অযথা লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত করবেননা।

(তর্জুমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩)।

তাসাওউফ সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে বর্তমান যুগের সাহিত্য এবং স্বয়ং মাওলানার নিজস্ব লেখা থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছু আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু এতো সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরেও যেভাবে মাওলানাকে তাসাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞ ও তা অস্বীকারকারী বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে অভিযোগকারী দলের দু'জনকে বেছে নিচ্ছি যাঁরা বিশদভাবে তাদের ধারণা ও বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে একজন মাওলানা হাকিম আবদুর রশীদ মাহমূদ গাংগুহী এবং অপরজন মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী সম্পাদক ফুরকান-লাখ্‌নো।

এক নজরে হাকিম আব্দুর রশীদ মাহ্মূদের অভিযোগ

জনাব হাকিম সাহেব বলেন ঃ

দ্বীনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিভাগ রয়েছে সলুক, তাসাওউফ ও ইহ্সান সম্পর্কে। জামায়াতের নেতৃবৃন্দ যেহেতু এর থেকে আকিদাহ্ ও আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ দূরে রয়েছেন, সে জন্যে এখন এ জামায়াতের মেজাজ প্রকৃতি এই তৈরী হচ্ছে যে, এ বিভাগের মংগল থেকে তাঁরা শুধু বঞ্চিতই নন বরঞ্চ এ সংগ্রামের ধারক বাহক সূফীয়ায়ে কেরাম ও আরবাবে সলুকের (যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কুফরস্তানে ইসলাম প্রচারের জন্যে আদিষ্ট ছিলেন এবং যাঁদের মাধ্যমে এখানে কোটি কোটি মুসলমান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে) ক্রোধের শিকার হতে চলেছেন এবং যেসব মহান ব্যক্তিবর্গ কুরআন ও সুন্নাতের মাখন ভক্ষণ করেন ও করান, তাদেরকে যোগী, সন্নাসী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। তাঁরা আন্দাজ করতে পারছেন না যে তারা কত বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কত বড়ো স্পর্ধা দেখানো হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যতঃ সলুক ও ইহসান অস্বীকার করেন না। কিন্তু ইহসান ও সলুক হাসিল করার যে পরিচিত তরিকা সূফীয়ায়ে কেরাম দেখিয়ে দিয়েছেন তা কঠোর ভাবে খন্ডন করেন। তারা শুধু তরিকাগুলোর প্রতিই দ্বিমত পোষণ করেন না বরঞ্চ তরিকা অবলম্বনকারীদের হেয় প্রতিপন্ন করে।

(তর্জুমানুল কুরআন, মার্চ-মে, ১৯৫১)

এ উধৃতি সামনে রাখার পর প্রথম প্রশ্ন হলো এই যে, তাহলে সেটা কোন্ ধরনের তাসাওউফ যার থেকে আকিদাহ ও আমলের দিক দিয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দ দূরে রয়েছেন? আর যদি তা সেই তাসাওউফ হয়-যা মাওলানা মওদূদী তাঁর প্রবন্ধে এক নম্বর বলে চিহ্নিত করেছেন, তাহলে তিনি ত তার সত্যায়ন করেছেন। আর শুধু সত্যায়ন নয়, বরঞ্চ তা তিনি জীবন্ত করতে ও তার প্রচার প্রসার করতে চান। তাহলে আকীদাহ ও আমলের দিক দিয়ে তার থেকে দূরে থাকার কি অর্থ হয়? উপরন্তু যে ব্যক্তি দ্বীনকে তার সমুদয় বিভাগসহ একটি জীবন বিধান হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্যে বিগত পঁচিশ বছর যাবত সংগ্রামরত রয়েছেন এবং কার্যতঃ তা কায়েম ও কার্যকর করার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা, "দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থেকে তিনি আকীদাহ ও আমলের দিক দিয়ে দূরে রয়েছেন"-এমন এক আজব কথা যা একেবারে অর্থহীন। এ অবস্থায় মাওলানা

মওদূদী ও তাঁর সংগী সাথীগণ স্পষ্টতঃ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ-এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় অভিযোগকারীর ওয়াজেব হয়ে যায়, মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সংগী সাথীদের কুফর ও ঈমানের ফয়সালা করে দেয়া।

আর তাঁরা যদি মাওলানা মওদূদীর দুই নম্বর তাসাওউফ বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তা ত মোটেই দ্বীনের কোন বিভাগ নয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হওয়া ত দূরের কথা। মাওলানা মওদূদীর এ দৃষ্টিভংগী ত প্রশংসনীয় ও অনুসরণযোগ্য যে তিনি নিজেকে এবং তাঁর জামায়াতকে এ ধরনের তাসাওউফ থেকে দূরে রেখেছেন। এ গলি পথে যদি কোন ঘোড়সওয়ার থাকে ত সে বড়ো শখ করে এ গলিতে দৌড়াতে থাক। যে তার দৈহিক শক্তি সামর্থ ও তৎপরতার জন্যে স্বয়ং খোদার কাছে জবাবদিহি করবে। কিন্তু তার কি অধিকার আছে যে সে কোন মর্দে মুমেনের কাছে এমন আকিদাহ ও আমলের দাবী করবে যার মধ্যে শরিয়ত ও তরিকত একে অপর থেকে সম্পর্কহীন বরঞ্চ অনেক সময় পরস্পর সাংঘর্ষিক করে রাখা হয়েছে?

আর যদি তাঁরা ৩ নং তাসাওউফের কথা বলে থাকেন তাহলে প্রশ্ন এই যে, এ তাসাওউফের কোন্ অংশগুলো এমন যা কিতাব ও সুন্নাত সম্মত কিন্তু মাওলানা মওদূদী আকীদাহ্ ও আমলের দিক থেকে তার থেকে দূরে আছেন? তা যদি তাঁরা চিহ্নিত করতে পারেন ত করুন। যতোক্ষণ তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না হবে ততোক্ষণ মাওলানার আকিদাহ ও আমলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যেতে পারে না।

এখন রইলো সেসব অংশ যা কিতাব ও সুন্নাতের খেলাপ। মাওলানা চাইছিলেন তার সংশোধন। এখন যদি আমল ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে কিতাব ও সুন্নাত বিরোধী তাসাওউফ থেকে তিনি দূরে থেকে থাকেন তাহলে এ ছিল তাঁর এক মর্দে মুমেনের আচরণ। যারা কিতাব ও সুন্নাত পরিপন্থী অংশগুলোকে মাওলানার আকিদাহ ও আমলের অর্ন্তভুক্ত করতে চান তাদের অপরের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং নিজেদের কুরআন সুন্নাহ্র উপর ঈমান আনার বিষয়টি চিন্তা করে দেখা উচিত।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যাদের মন মস্তিষ্ক স্বয়ং এতো জটিলতা ও ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ তারা এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন যার মানসিক স্থিরতা ও চিন্তার ভার সাম্য দৃষ্টান্তমূলক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূফীয়ায়ে কেরাম ও আরবাবে সলুককে যে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং যাঁরা কুরআন ও সুন্নাতের মাখন ভক্ষণ করেন এবং করান তাঁদেরকে যোগী, যরদশ্তী ও সন্নাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে–তার প্রমাণ কি? অভিযোগকারিগণ এটা কোথায় পেলেন? তাদের অভিযোগের ভিত্তি কি সেই বাচন যা "তাজদীদ ও আহ্ইয়ায়ে দ্বীন"-এ আছে? যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

> "এ মতবাদ সভ্যতা সংস্কৃতি বহির্ভূত এক মতবাদ। কিন্তু সভ্যতা সংস্কৃতির উপর এ বিভিন্ন পন্থায় প্রভাবশীল হয়ে পড়ে। তার বুনিয়াদের উপরে এক বিশেষ ধরনের দার্শনিক ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে যার বিভিন্নরূপ বেদান্তিজম, প্লাটোনিজম, যোগ, তাসাওউফ, খৃষ্টীয়, সন্নাসব্রত, বৌদ্ধমত প্রভৃতি নামে পরিচিত।"

যদি এ বাচনই হয় এমন যার থেকে অভিযোগ কারিগণ সূফীয়ায়ে কেরামের নিন্দিত হওয়ার এবং তাঁদের যোগী, সন্নাসী প্রভৃতি নামে অভিহিত হওয়ার কারণ বের করেছেন, তাহলে এ ধরনের কথা বার্তায় পাঠশালার শিশু হাস্য সংবরণ করতে পারবে না। আর সম্ভবতঃ কোথাও থেকে এর জন্য প্রশংসাও কুড়াতে পারবেন না। কারণ এখানে 'তাসাওউফ' শব্দটি ত এক অর্থে বলা হয়নি যাকে মাওলানা মওদূদী তিন প্রকার তাসাওউফের এক নম্বরে বলেছেন। মাওলানা ত 'তাসাওউফ' শব্দের পূর্বে ও পরে বেদান্তিজম, প্লাটোনিজম, যোগ, খৃষ্টান সন্নাসব্রত প্রভৃতি লিখে স্বয়ং একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি যা বলতে চান তা হলো দুই নম্বরের তাসাওউফ। তাঁর বক্তব্য এতো সুস্পষ্ট যে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।.......

অভিযোগকারী হযরত ত বড়োজোর এ কথা বলতে পারতেন যে 'তাসাওউফ' শব্দটি ব্যবহারে অস্পষ্টতা আছে (এ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে)। যেমন মাওলানা মওদূদীর কথায়, 'তাসাওউফ' কোন একটি জিনিসের নাম নয়, বরঞ্চ বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব এর ব্যবহার ঠিক নয়। বিষয়টি এ পর্যন্ত সীমিত থাকলে এ একটা শাব্দিক বিতর্ক হিসাবে রয়ে যায়। আকীদাহ ও আমলের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় প্রতিপক্ষকে "বিরাট স্পর্ধা প্রদর্শণকারী" বলে অভিযুক্ত করার কোন প্রয়োজন থাকে না।

যদি মাওলানা মওদূদীর প্রবন্ধের উপরোক্ত অংশের পরিবর্তে অন্য কোন বক্তব্যের কারণে অভিযোগকারী এতোবড়ো সাংঘাতিক অপরাধ আবিষ্কার করে থাকেন তাহলে সেকথা প্রবন্ধের অংশটুকু ছাড়া পেশ করেননি কেন? তার বরাত

দিতে এতো কার্পণ্য কেন? দুনিয়াবাসীকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার কি প্রয়োজন নেই যে মাওলানা মওদূদী অমুক অমুক বইয়ে এসব লিখেছেন যাতে কেউ ইচ্ছা করলে তা স্বচক্ষে দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

অভিযোগকারী আরও বলেন,

কাল পর্যন্ত খাজা মঈনুদ্দীন আজমীরী ও খাজা বখতিয়ার কাকীর মতো যেসব লোক হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে এ কুফরস্তানে ইসলামের প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলেন আজ তাঁদেরকে যোগী-সন্নাসী মনে করা হচ্ছে। অথচ তাঁরা এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে বলা হয় ঃ

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত। অতএব তাদেরই ইক্‌তাদা কর।"

এ 'ধারণার' উৎসটা কি? তা কি আপনার বলা উচিত নয়? আপনি যদি 'কাশ্‌ফ' ও 'ইলহামের' দ্বারা এ কথা বলে থাকেন, তাহলে এ 'কাশ্‌ফ' ও 'ইলহাম' আপনার জন্যেই মুবারক হোক। মাওলানা মওদূদী ত এর থেকে দূরে রয়েছেন। অবশ্য এ 'কাশ্‌ফ' ও 'ইলহাম' এর ভিত্তিতে যে খবর আপনি দুনিয়াকে দিলেন তার দায়িত্ব থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না। যদি এ বুনিয়াদ পেশ করে খোদার আদালতে আপনি দায় মুক্ত হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করেন ত এ কাজ করার স্বাধীনতা আপনার আছে। কিন্তু আপনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করার অধিকার দুনিয়াবাসীর আছে যে-এ সব অভিযোগের সুস্পষ্ট বুনিয়াদ কি?

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমীরী ও চিশতিয়া সিলসিলার অন্যান্য মনীষীগণ হিন্দুস্তানে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এত সেই সব অবদান যার ভিত্তিতে শুধু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে নয়, বরঞ্চ খালেস আখলাকী ও দ্বীনী দিক দিয়েও প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে তাঁদের জন্যে অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে। ....কিন্তু সকল লজ্জার মাথা খেয়ে যখন মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা হয় যে, তিনি চিশ্‌তিয়া সিলসিলার বুজুর্গানকে যোগী ও সন্নাসী বলেছেন, তখন এমন কি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে যার থেকে পাঠকবৃন্দ অনুমান করতে পারবেন যে মাওলানা মওদূদী তাঁদেরকে যোগী ও সন্নাসী বলেছেন না অন্য কিছু?

ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে যখন সারা ভারতে হিন্দু মুসলিম দাংগা হাংগামার আগুন জ্বলছিল, তখন গোয়ালিয়র রাজ্য থেকে একজন সেখানকার

অবস্থা বর্ণনা করে মাওলানার সুপরামর্শ চান। মাওলানা আগষ্ট ১৯৪৬-এর তর্জুমানুল কুরআনে তার যে জবাব দেন তার কিছু উধৃতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"আপনি বলেন, আমরা হিন্দু রাজ্যে বসবাস করি এবং আমরা মুষ্টিমেয়। এখানে মুসলমানদের কোন ইজ্জৎ ও নিরাপত্তা নেই।"

কিন্তু আপনারা কি ভুলে গেছেন যে আজ থেকে আট-ন'শ বছর পূর্বে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) আজমীরের হিন্দু রাজ্যে এসে যখন বাস করতে থাকেন, অবস্থা কি তখন এর থেকে ভালো ছিল, না মন্দ? সে সময়ে কোন্ জিনিস তাঁর হিফাযত করেছিল?

এর জবাব তিনি এমনি ঈমান উদ্দীপক ভাষায় দেন ঃ

"আমার দ্বীনী ভাইসব! আমার কথা শুনুন বা না শুনুন, কিন্তু আমি ত এ কথাই বলতে থাকব, আপনাদের জন্যে এর থেকে অন্য কোন কাজে আর কল্যাণ নেই যে, আপনারা সত্যিকারের মুসলমান হ'য়ে যান এবং মুসলমান হিসাবে যে দায়িত্ব তা পালন করতে থাকুন।"

দেখুন, যেহেতু মাওলানা মওদূদী ও সংগী সাথীগণ নিজেদের শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী সে সব কাজই করছেন যা খাজা সাহেব ও তাঁর সাথীগণ আপন আপন যুগে তাঁদের সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী করেছেন, এ জন্যে তিনি (মাওলানা মওদূদী) নিজের দাওয়াতী তৎপরতার একপর্যায়ে ফলপ্রসূ পন্থায় খাজা সাহেবের যুগের স্মরণ করিয়ে দেন এবং খাজা সাহেবের জীবন থেকে ওসব বিষয়ই লক্ষণীয় করে পেশ করেন যা তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের জন্যে হামেশা হিদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে অর্থাৎ তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্র, তাঁর দাওয়াতী ও তবলিগী তৎপরতা দৃঢ়-সংকল্প, অবিচলতা প্রভৃতি।

অভিযোগকারী বুযর্গ ত আকাংখাসূলভ ভাষায় বলেছেন, "এসব এমন লোক যাদের সম্পর্কে বলা হয় যে তাঁরা হিদায়েত প্রাপ্ত। অতএব হিদায়েত প্রাপ্তির বেলায় তাঁদের অনুসরণ করুন।"

কিন্তু মাওলানা মওদূদী বাস্তবতঃ ও কার্যত ওসব হিদায়েত প্রাপ্ত লোকদেরই অনুসরণ করেছেন এবং অপরকেও তাঁদের অনুসরণ করতে বলেছেন। যদি অভিযোগকারী বুযর্গ এ বিষয়ে কোন খবর না রেখে থাকেন তাহলে তার জন্যে বিলাপ করা উচিত।

মোট কথা প্রকৃত ঘটনা তাই যা আপনি উপরের ছত্রগুলোতে লক্ষ করেছেন।

প্রসংগক্রমে আমি এ কথা বলে দিতে চাই যে, মাওলানা মওদূদী,

ব্যক্তিগতভাবে খাজা সাহেবের সাথে এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও এক ধরনের বংশগত সম্পর্ক রাখতেন। কারণ মওদূদী পরিবারের পূর্বপুরুষ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তী হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমীরীর শায়খুশ্‌ শুয়ূখ (পর দাদা পীর) ছিলেন।

হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র) চিশ্‌তীয়া সিলসিলার একজন প্রসিদ্ধ বুযর্গ ছিলেন যিনি প্রায় শতাব্দীকাল যাবত ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ করেন।

মাওলানা ইলিয়াস (র) যখন মিওয়াতে তবলিগী কাজ শুরু করেন তখন মাওলানা পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে স্বয়ং সে এলাকায় সফর করেন। সেখানে যা কিছু দেখেন তা একটি প্রবন্ধের আকারে তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত করেন। এ প্রবন্ধে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া এবং তাঁর খলিফাগণ ও অনুসারীগণ তবলিগী তৎপরতার উল্লেখ এ ভাবে করেন ঃ

> "মিও কওম দিল্লীর পার্শ্ববর্তী আলোর, ভরতপুর, গৌড়্গানুহ্ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস করে। আনুমানিক তাদের সংখ্যা ছত্রিশ লক্ষের কম হবে না। কয়েক শতাব্দী পূর্বে খুব সম্ভব হযরত নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (র) এবং তাঁর খলিফা ও অনুসারীগণের প্রচেষ্টায় এ কওমের মধ্যে ইসলামের বাণী পৌঁছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালে মুসলমান শাসক ও জায়গীরদারদের অবহেলায় সেখানে ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। পরিণাম এ হয় যে, যারা রাজধানীর এতো নিকটে বসবাস করতো তাদের মধ্যে প্রাচীন জাহেলিয়াতের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং ক্রমশঃ তারা ইসলাম থেকে এতো দূরে সরে পড়ে যে, "আমরা মুসলমান"-এ ধারণা ব্যতীত তাদের মধ্যে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।" (তর্জুমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৪১)।

উপরের বক্তব্যে আপনি দেখতে পারেন যে সূফীয়ায়ে কেরামের চেষ্টা সাধনা স্মরণ করে মাওলানা কত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে সব পরিণামের উল্লেখ করেন যা সূফী বুযর্গানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণকারীদের অবহেলার কারণে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণের জন্যে যে পদচিহ্ন ও প্রভাব রেখে গেছেন, পরবর্তীগণের ত উচিত ছিল সেসব কে আরো জীবন্ত করা অথবা অন্ততঃপক্ষে তা মুছে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে তাঁদের সকল অবদান ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন তাই করা যা পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের যুগে করেছেন।

চিশ্‌তিয়া সিলসিলার আর একজন বুযর্গ হযরত মুহাম্মদ গেসো দারাজ (র) হযরত নাসিরুদ্দীন চেরাগদেহলীর প্রধান খলিফা ছিলেন এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে বছরের পর বছর সফর করে দাওয়াত ও তবলিগের কাজ করেন এবং শেষ বয়সে গুলবার্গ (দাক্ষিণাত্য) গিয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি এতো বিরাট সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন যে, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী তাঁকে চিশ্‌তীয়া খান্দানের সুলতানে কলম (সাহিত্য সম্রাট) নামে অভিহিত করেন। তাঁর একটি গ্রন্থ 'খাতেমা' সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"তাসাওউফ যে ইল্‌ম ও আমলের নাম তার সঠিক চিত্র যদি দেখতে চান ত এসব আওলিয়ায়ে কেরামের গ্রন্থাবলী পড়ে দেখুন। তাঁরাই ইল্‌ম ও আমলের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন।"

(তর্জুমানুল কুরআন, জুমাদিউল ওখ্‌রা ও রজব, হিঃ ১৩৫৬)

যাঁরা বুযর্গানে চিশতিয়াকে তাসাওউফের ইল্‌ম ও আমলের প্রকৃত প্রতিনিধি মনে করেন এবং তাসাওউফের চিত্র দেখার জন্যে তাঁদের গ্রন্থাবলী দেখার পরামর্শ দেন, তাদের প্রতি এ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, সূফীয়ায়ে কেরামকে তাঁরা হেয় জ্ঞান করেন এবং তাঁদেরকে যোগী, সন্নাসী প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। আমি পাঠকবৃন্দকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা এটাকে কোন্ ভাষায় স্মরণ করতে চান?

এক নজরে মাওলানা মন্‌যূর নো'মানীর ধারণা ও অভিযোগ

মাওলানা মনযূর নো'মানী তাসাওউফ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন তার বিশদ বিবরণ "জামায়াতে ইসলামী ও তার বিরুদ্ধে ফতোয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যায় যা তিনি 'আল্ ফুরকান' যুলকা'দ ১৩৭০ হিঃ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ

> "জামায়াতের যেসব বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ তাসাওউফের বিরুদ্ধে পূর্বে ও এখন স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক ভাবে যা কিছু লিখেছেন, আমি সে সব ব্যক্তিগত ভাবে জানি এবং আমার এ কথা বলার অধিকার আছে যে, ইলমে দ্বীনের কোন কোন বিভাগে যদিও তাঁদের প্রজ্ঞা প্রশংসনীয় কিন্তু দ্বীনের এ বিভাগে অর্থাৎ তাসাওউফে তাঁরা একেবারে অজ্ঞ এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্যে অন্ততঃপক্ষে যেসব জিনিস কারো অর্জন করা উচিত, তাঁরা তা অর্জন করার

চেষ্টাও করেন নি। যদিও তাসাওউফ ও তাসাওউফ পন্থীদের বইপুস্তক পড়াশুনা করাও অনেকের পক্ষে এ জন্যে যথেষ্ট নয়, কিন্তু আপনাদের এ বিভাগ সম্পর্কে কোন অনুরাগই নেই। এ জন্যে আপনারা এ সব পড়াশুনার জন্যে কোন মনোযোগ দেন নি" (উক্ত পত্রিকা-পৃঃ ১৮, ১৯)

তিনি আরও বলেন ঃ

এ অধমের যতোটুকু জ্ঞান ও আন্দাজ অনুমান আছে তার ভিত্তিতে বলতে চাই যে আপনারা 'তাসাওউফ' জানার জন্যে ও তার ভেতর বাইর বুঝবার জন্যে ন। এ বিষয়ের যথেষ্ট পরিমাণ বইপুস্তক পড়াশুনা করেছেন, আর না এ ধরনের কোন জীবিত ব্যক্তিকে ছাত্রসুলভ মন নিয়ে জানবার চেষ্টা করেছেন যাঁর জীবনে আপনারা 'তাসাওউফ' ও তার সুফল স্বচক্ষে দেখতে পেতেন। আর প্রকৃত পক্ষে তাসাওউফ জানা ও তা হাসিল করার এই একমাত্র সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায়। কিন্তু এসব না জানা সত্ত্বেও যা কিছু এবং যে ভাবে আপনারা এ বিষয়ে লিখেছেন, এ অধমের দৃষ্টিতে আপনাদের মর্যাদা ও অবস্থান থেকে অনেক সীমা অতিক্রম করেছেন এবং এ সব প্রবন্ধ ত্রুটিপূর্ণ হোক অথবা সঠিক, তার প্রতিক্রিয়া আপনার শত শত হাজার হাজার অনুসারীদের মধ্যে এ হয়েছে যে দ্বীনের এ বিভাগকে (তাসাওউফ) একেবারে গোমরাহী ও ফাসাদ মনে করেন এবং জাহেলিয়াত, সন্নাসব্রত ও মুশরেকী ধারণা প্রভাবিত এক জগাখিচুড়ি বলে ধারণা করেন।"

এ সব পড়ার পর সংগে সংগে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যার জবাবও প্রয়োজন আছে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, যে তাসাওউফের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তা কোন্ ধরনের তাসাওউফ? এ তাসাওউফ যদি মাওলানা মওদূদীর বর্ণিত তিন প্রকার তাসাওউফের এক নম্বর তাসাওউফ হয়ে থাকে যাকে দ্বীনের একটি বিভাগ বলা হয়েছে, তাহলে তার থেকে একেবারে ওয়াকেফহাল না হওয়ার, তার প্রতি কোন অনুরাগ না রাখার এবং তার প্রতি মনোযোগ না দেয়ার কি অর্থ হতে পারে? এ আজব দুনিয়ার যে সব আজব কথা শুনা যায় তার মধ্যে একটি এই যে, যারা দ্বীনকে জীবনের সকল বিভাগসহ একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করার এবং তা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে সব চেয়ে সঠিক একক ভূমিকা পালন করছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে 'দ্বীনের একটি বিভাগ' সম্পর্কে তারা অজ্ঞ।

আর যদি মাওলানা নো'মানী এ তাসাওউফ বলতে মাওলানা মওদূদীর দু'নম্বর তাসাওউফ বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে শত সহস্র প্রশংসার হকদার সেসব

লোক যাঁরা এর প্রতি কোন অনুরাগ রাখেন না। তাহলে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদেরকে দোষীগণ্য করা হচ্ছে। আর যদি তিন নম্বর তাসাওউফ তিনি বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত এ তাসাওউফের যে অংশটি নিয়ে বিতর্ক করা হচ্ছে তা চিহ্নিত করা না হয়েছে ততোক্ষণ এ অভিযোগের সত্যতা নির্ণয় করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে যদিও মাওলানা নো'মানী এ কথা বলেছেন যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ দাবী করছেন। কিন্তু তাঁর কথা বিভিন্ন কারণে ভ্রান্ত। প্রথম কথা এই যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এমন পর্যায়ের নয় যার ভিত্তিতে তিনি কাউকে তাসাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তার প্রতি কোন অনুরাগ না রাখার বিরাট অভিযোগ করতে পারেন। তর্কের খাতিরে যদি কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর এ অভিজ্ঞতা মেনে নেয়া হয় তথাপি তাঁর এ দাবী সঠিক হতে পারে না। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা সাধারণতঃ মানুষের ইল্মী ও আমলী যোগ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এটা নয় যে, কে কোন্ কোন্ কিতাব পড়াশুনা করেছে, কোন্ কোন্ জীবিত ব্যক্তিগণকে ছাত্রসুলভ মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার পর তাসাওউফ ও তার বাস্তব প্রতিফলন স্বচক্ষে দেখেছেন।

মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী বলেন ঃ

আমি ত জানি না যে মাওলানা মওদূদী কোথায় এবং কি পড়াশুনা করেছেন? কিন্তু আমি এ কথা ভালোভাবে জানি যে তিনি অত্যন্ত মেধাবী, যোগ্য এবং বিরাট দূর দৃষ্টিসম্পন্ন আলেম ছিলেন।

-(তর্জুমানুল কুরআন, মার্চ-মে, ১৯৫১)

অনুরূপ মালিক গোলাম আলী বলেন ঃ

যদিও বিগত পনেরো বছর যাবত মাওলানা মওদূদীর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে কিন্তু আমার এবং মাওলানা মুহতারামের মেজাজ প্রকৃতিই কিছুটা এ ধরনের যে, ব্যক্তিগত অবস্থা ও জীবনী সম্পর্কে আলাপ করার সুযোগই হয় নি। মাওলানার বিগত ব্যক্তিগত অবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানার আগ্রহ আমার মধ্যে এ জন্যে সৃষ্টি হয়নি যে, তাঁর জীবন এমন একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ যার বিভিন্ন অধ্যায় পরস্পর এতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সদৃশ যে তার যে কোন একটি অধ্যায় বা একটি পৃষ্ঠাও যদি মনোযোগ দিয়ে পড়া যায় তাহলে অন্যান্য অধ্যায় ও পৃষ্ঠা দেখার কোন প্রয়োজন হবে না এবং সমগ্র গ্রন্থ সম্পর্কে

একটা সঠিক ও সার্বিক ধারণা করা একেবারে সহজ হয়ে যায়।

-(মাওলানা মওদূদী আপন ও অন্যান্যের দৃষ্টিতে পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮)।

মাওলানা নোমানী এ কথা বলতে পারতেন, যদি আপনারা অমুক অমুক বই পড়ে থাকেন ত ভলো কথা। পড়ে না থাকলে তা পড়াশুনা করে নিজেদের মতামত পেশ করুন। আর অমুক অমুক বুযর্গের সাহচর্য আপনাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। এর সুযোগ হয়ে না থাকলে এ সুযোগ তালাশ করুন। এ কথাই মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী এক পত্রে মাওলানা মওদূদীকে বলেন ঃ

"কুরআন থেকে কোন বিষয়ের সমাধান বের করতে হলে ইমাম রাযীর 'আহকামুল কুরআন', ইবনুল আরবীর 'আহকামুল কুরআন', তাফসীরে রুহুল মায়ানী এবং থানবী সাহেবের বয়ানুল কুরআন অবশ্যই দেখে নেবেন।"

তারপর আহলে তাসাওউফ-এর সাহচর্য জরুরী মনে করে পরামর্শ দেন ঃ

"আপনার নিকটেই অমুক থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতে থাকবেন।"

মাওলানা সে পত্রের জবাব সঠিক ভাবেই দিয়েছেন যা তর্জুমানুল কুরআন, যিলকাদ ও যিলহজ্ব সংখ্যা-১৩৭০ হিঃ প্রকাশিত হয়।

তাসাওউফ থেকে বঞ্চিত ও অজ্ঞ থাকার যে অভিযোগ করা হয় তার জবাবে মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী যা কিছু বলেছেন তার একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

আমার ধারণামতে মাওলানা নো'মানীর এ অভিমত ভ্রান্ত ধারণা থেকে করা হয়েছে। জামায়াতের মধ্যে সকল লোক একই রুচি প্রকৃতির নয়। এমনও হতে পারে যে জামায়াতের কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাসাওউফের প্রতি কোন অনুরাগ রাখেন না। এটাকে কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সম্পর্কহীন মনে করে হয়ত তা জানবার কোন চেষ্টা করেন নি। কিন্তু তাই বলে এটা মনে করা যে, জামায়াতের সকল লোক একই রুচি প্রকৃতির তা ঠিক হবে না। ....আমার নিজের বেলা আমি একথা স্বীকার করি যে আমি এ বিষয়ে বেশী পড়াশুনা করি নি। তথাপি কেউ যদি এ ধারণা করে যে আমি এ বিষয়ে কোন কিছু মোটেই পড়িনি তাহলে সে ধারণা ঠিক হবে না। আমি এ বিষয়ের উপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রেসালা কুশায়রিয়া' বারবার পড়েছি, আবু তালেব মক্কীর 'কুওতুল কুলুব' এমন নিখুত ভাবে পড়াশুনা করেছি যে, সামান্য প্রস্তুতির পর তা যে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী তার উপর এক প্রবন্ধ লেখার জন্যে কাউকে মৌখিক বলে দিতে পারি।

ইমাম গায্যালীর 'ইহ্ইয়াউল উলুম' ছত্রছত্র পড়েছি এবং এক সময় এ আমার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এখনও সাহিত্য হিসাবে গোটা গ্রন্থখানি এবং চিন্তার দিক দিয়ে কোন কোন বিষয় বেশ ভালো লাগে। আল্লামা ইবনে কাইয়েমের বিরাট গ্রন্থ 'মাদারেজুস্ সালেকীন' দু'বার প্রতিটি অক্ষর অক্ষর পড়েছি। তাঁর 'ফাওয়ায়েদ' যা তাসাওউফের অন্তর্ভুক্ত, আমার এতো পছন্দের ছিলো যে, আমি এক সময় বন্ধু বান্ধবদেরকে তার সারাংশ মুখস্থ শুনিয়ে দিতাম। শাহ সাহেবেরও কিছু লেখা পড়েছি। মাওলানা রুমের মস্নবী এবং দেওয়ান হাফেজ বার বার পড়েছি। এক সময় গ্রীক্ দর্শন STOICISM এতো ভালো লাগতো এবং ইংরাজী ভাষায় তা এমন ভাবে পড়েছি যে, যদি কুরআন হাকীম আমাকে রক্ষা না করতো, তাহলে বহু প্রকার গোমরাহিতে লিপ্ত হতাম।"

অনুরূপ মাওলানা মওদূদী একবার বলেন ঃ

অধিকাংশ সময় সূফীয়ায়ে কেরামের সাহচর্য লাভে উপকৃত হয়েছি। কিছু কাল পর্যন্ত অমার এ অভ্যাস ছিল যে, যে কোন বুযর্গের সন্ধান পেতাম তাঁর সাথে মিলিত হতাম, তাঁর সাহচর্য লাভ করতাম। আমার আপন পরিবারও তাসাওউফ পন্থী ছিল এবং আমার পিতা পর্যন্ত বয়আত ও এরশাদের সিলসিলা জারী ছিল। তাসাওউফ সম্পর্কে মোটামোটি পড়াশুনাও করেছি। বিভিন্ন সূফী বুযর্গের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। এজন্যে তাসাওউফ ও তাসাওউফ পন্থীদের সম্পর্কে আমি যে সব ধারণা ও মতামতের জন্যে বদনাম হয়েছি, আপনি এমন এক ব্যক্তির ধারণা ও মতামত মনে করবেন না যে এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। আমি তাসাওউফ দেখেছি, তাসাওউফ পন্থীও দেখেছি এবং তাঁদের ভালো ও মন্দ দেখার পর এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমি এ কথা বলছি না যে আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যেকে মেনে নিক। কিন্তু এ আরজ অবশ্যই করব যে আমার মতামতকে নিছক ভাসাভাসা মতামত মনে করার ভুল যেন অন্যান্য লোকেও না করেন। এখনো কোন সাহেবে কামাল ব্যক্তি থেকে ফায়দা লাভ করতে আমার আপত্তি নেই এবং আমার মতামত পুনর্বিবেচনার যোগ্য।

-(তর্জুমানুল কুরআন, যুলকাদ-যুলহজ্জ –১৩৭০ হিঃ)

যদিও মাওলানা ইসলাহী অভিযোগকারীদের অবিচার ও বাড়াবাড়িতে বাধ্য হয়ে তাঁর তাসাওউফ সম্পর্কে পড়াশুনার বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন এবং মাওলানা মওদূদী তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যখন তিনি স্বয়ং বলেছেন যে, "আমার মতামতকে ভাসাভাসা মতামত গ্রহণের ভুল যেন করা না হয়। আমি এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ নই। আমি তাসাওউফ ও তাসাওউফ পন্থীকে দেখেছি। আমার প্রতিটি অভিমত পুনর্বিবেচনাযোগ্য।" তাহলে এটা কোন্ ধরনের কথা যে, "তিনি তাসাওউফ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ? এর প্রতি তোমার কোন অনুরাগ ছিল না। সে সম্পর্কে পড়াশুনা করতে কোন মনোযোগই দাওনি।"

যদি আপনারা তাসাওউফ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছেন এবং তা পড়া শুনা করে নিজের মনের মধ্যে এক লাইব্রেরী বানিয়ে রেখেছেন, তাহলে কেন নিজের সে জ্ঞান প্রকাশ করে তাঁর ভুলভ্রান্তি চিহ্নিত করছেন না? এ পথ ত খোলা আছে। এ পথে কেন অগ্রসর হচ্ছেননা? আপনি যদি নিজের অবস্থান সুদৃঢ় বলে নিশ্চয়তা দিতে চান, তাহলে অন্যকে শুধু অজ্ঞ বলে নীরব থাকা এ জন্যে যথেষ্ট নয়। আফসোস, যেখানে তাক্ওয়া ও ইহসানের কথা সব চেয়ে বেশী বলা হয়, সেখানে তাক্ওয়া ও ইহসানের তাৎপর্যকে জবেহ করা হচ্ছে। মাওলানা নোমানী উক্ত প্রবন্ধে বলেন ঃ

"অন্য ত যেমন তেমন, যদি হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী (র) ও তাঁর খলীফাগণ, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) শাহ ইসমাঈল শহীদ (র)-এর সিলসিলায়ে সলুকের ঐসব কর্মধারা (আশগাল) আপনার অনুসারীদের নিকটে বলা হয়, তাহলে আপনার সাহিত্যের মাধ্যমে তৈরী বহু 'মুহাক্কেক' ও 'মুজতাহিদ' অত্যন্ত নির্ভীকতার সাথে সে সবকে বিদআত, গোমরাহী ও গায়ের ইসলামী বলে ফতোয়া জারী করবেন। আর মুখে যদি পরিষ্কার করে নাও বলেন ত তাদের মনের কথা এটাই হবে যে এ সব লোক প্রকৃত পক্ষে ইসলামের সঠিক প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত ছিলেননা।"

তারপর বলেন ঃ

"আমি এ বিষয়ে অনবগত নই যে, মাওলানা মওদূদী তাঁর কোন কোন প্রবন্ধে উপরোক্ত বুযর্গানে দ্বীনের তাজদীদি খেদমতের স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এ সব হযরত যে তাসাওউফ পেশ করেছিলেন তা আপন প্রাণশক্তি ও মূলের দিক দিয়ে গায়ের ইসলামী ছিল না। কিন্তু আপনাদের ঐসব অনুসারী যারা

ইসলামের প্রাণশক্তি ও তার কাঠামো সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান আপনার প্রবন্ধাদি থেকে আহরণ করেছে, তাদের সামনে যদি ও সব বুযর্গানে দ্বীনের সিল্সিলায়ে তাসাওউফের কর্মধারা তাঁদেরই গ্রন্থাবলী থেকে পেশ করা হয় তাহলে তারা এটাই মনে করবে যে মাওলানা মওদূদী হয়তোবা নিছক উদারতা অথবা হিকমতের খাতিরে এবং সাধারণ পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ লিখেছেন। নতুবা যে তাসাউওফের কথা উপরোক্ত মনীষীগণ নিজেদের কিতাবে লিখেছেন তা সবই বিদআত ও গোমরাহী।"

তিনি আরও বলেন ঃ

"ইসলামের গোটা ইতিহাসে" তাসাওউফ" যে জিনিসকে মনে করা হয়েছে এবং এ নামে আল্লাহর অলীগণের বিভিন্ন সিলসিলায় প্রচলিত ছিল তাকে জাহেলিয়াত, রাহবানিয়াত ও শির্ক থেকে উদ্ভূত নিকৃষ্ট ধরনের এক গোমরাহী মনে করা হয় এবং তার ধারকবাহকদের সম্পর্কে যে ধারণা ও মনের যে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, তাই হয়।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০-২১)

এ কথা পড়ার পর এর সুস্পষ্ট ফল এ দাঁড়ায় যে, অভিযোগকারী হযরত এ সব কথা প্রকৃত পক্ষে কাশ্ফ, খাব (স্বপ্ন), দিব্যজ্ঞান (INTUITION), অথবা ইলহামের দ্বারা বলেছেন। আর একেই তিনি ব্যক্তিগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বলছেন। নতুবা "মনে করে", "আর না করে", "ফতুয়া জারী করবে", "মুখে না বলুন কিন্তু তাদের মনের ফয়সালা এটাই হবে", অবশ্যই তারা এমন মনে করবে", "যে ধারণা এবং মনের যে ফয়সালা হওয়া উচিত, তাই হয়"–এ সব কথার কি অর্থ? যখন কোন ব্যক্তি অথবা দল কিছু মনে করে, ধারণা করে মুখ দিয়ে কিছু বলেনা কিন্তু তার ধারণা এবং তার মনের ফয়সালা অন্য কিছু হয় তাহলে খবরটা আপনাকে কে দিল? যেহেতু কাশ্ফ ও ইলহামের জন্যে কোন সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রমাণের দরকার হয়না, এ জন্যে নিজের বরাত দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করা হয়। তাই দেখা যায় অভিযোগকারী সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজনই মনে করেননি। উপরন্তু কাশ্ফ ও ইলহামের ব্যাপারে চিন্তার ভারসাম্য ও সংগতিশীলতা বাধ্যতামূলক নয়, সে জন্যে অভিযোগকারী একদিকে মাওলানা মওদূদীর অনুসারিদের এ মর্যাদার উল্লেখ করেছেন যে, তারা তারই সাহিত্যের মাধ্যমেই তৈরী এবং ইসলামের প্রাণশক্তি ও কাঠামো সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান তাঁরই প্রবন্ধাদি থেকে হাসিল করেছেন বরঞ্চ দ্বীনের প্রত্যেক বিভাগে তাঁকেই ইল্‌ম ও গবেষণার চূড়ান্ত ব্যক্তি মনে করেন, অপর দিকে তাঁর

অনুসারিদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন যে বুযর্গানে দ্বীনের তাজদীদে খেদমতের স্বীকৃতি সম্পর্কে মাওলানা যে অভিমত প্রকাশ করেন তাকে অবশ্যই এরূপ মনে করেন যে এ নিছক উদারতা অথবা সাধারণ পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফল। অথচ যারা মনের মধ্যে এক ধরনের সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন এবং কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা পোষণ করেন তাঁদের দৃষ্টিভংগী সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য উচিত ছিল তাঁদের লেখা ও প্রবন্ধাদির বরাত দেয়া এবং এল্‌মী সমালোচনা করে ভুল ধরিয়ে দেয়া। যাহোক এ যদি স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে এ নিয়ে মাওলানা নোমানী আত্মতৃপ্তি লাভ করুন। আমরা ত পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে এ-ই যদি 'তাসাওউফ' হয়, তাহলে তা যে সরাসরি "গোমরাহী ফাসাদ" এবং সরাসরি "বিদআত ও গোমরাহী" তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ প্রসংগে তিনি আরও একটি বাক্য সংযোজন করেন ঃ

"মাওলানা মওদূদী যেকথা বলতে বাকী রেখেছিলেন সম্প্রতি সে অভাবটুকু পূরণ করেছেন মাওলানা ইসলাহী।"

এতে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন,

"তাসাওউফ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী একটি দল হিসাবে কোন মাসলাক পোষণ করে না। কারণ তা এ ধরনের কোন বিষয়ের মীমাংসা করার জন্যে তৈরী হয় নি। মাওলানা মওদূদীর এ ব্যাপারে দৃষ্টিভংগী খুব নরম। "তাজদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন ও দীনিয়াত গ্রন্থদ্বয় থেকে জানা যায়। কিন্তু আপনাদেরকে পরিষ্কার বলতে চাই যে, আমি প্রচলিত তাসাওউফকে বিদআত মনে করি এবং আমার মতে ইহসানের সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই যা শরিয়তের বাঞ্ছিত এবং যা নির্ভরযোগ্য।"

"সূফীয়ায়ে কেরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য এই যে, 'তাসাওইফ' এবং 'ইহসান' দু'টি একবারেই পৃথক বস্তু। যাঁরা এ দু'টোকে এক মনে করেছেন তারা ভুল করেছেন। এটা ভিন্ন কথা যে তাঁদের অনেকেরই নিয়ত সৎ ছিল।"

'তাসাওউফ' সম্পর্কে একটি জামায়াত হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর মাসলাক বলতে যা বুঝায়-মাওলানা নোমানী সম্ভবতঃ তার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করবেন না। কারণ তিনি স্বয়ং জামায়াতের রুকন ছিলেন এবং তাঁর

জানা আছে যে কোন্ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্যে এ গঠিত হয়। অবশ্য তাঁর যা কিছু অভিযোগ তাহলো এই যে, তাসাওউফ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী যেটুকু শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন ইসলাহী সাহেব তা দূর করেছেন। এ প্রসংগে আমরা সর্ব প্রথম এ কথা বলবো যে, মাওলানা মওদূদীর শিথিলতা কি এবং কেন এবং তারপর মাওলানা ইসলাহী সম্পর্কে বলবো যে ঃ তিনি কেন তা দূর করেন।

মাওলানা ইসলাহী মাওলানা মওদূদীর যে দু'টি বইয়ের বরাত উপরোক্ত উধৃতিতে দিয়েছেন আমরা তার থেকেই মাওলানার চিন্তা ধারণা উধৃতি করছি। 'তাজদীদ ও ইহ্ইয়ায়ে দ্বীনে' একস্থানে তিনি বলেনঃ

হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে সানীর সময় থেকে শাহ সাহেব (শাহ অলীউল্লাহ) এবং তাঁর খলিফাগণের সময় পর্যন্ত যেসব তাজদীদী কাজ হয়েছে তার মধ্যে যে প্রথম জিনিসটি সম্বন্ধে মনে খট্কা পয়দা করে তা এই যে তাঁরা 'তাসাওউফ' সম্বন্ধে মুসলমানদের রোগ নির্ণয় করতে পারেন নি এবং তাদেরকে পুনরায় সে পথই দেখিয়ে দিয়েছেন যার থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন ছিল। আসলে সে তাসাওউফে আমার কোন আপত্তি নেই যা এ সব মনীষীগণ পেশ করেছেন। তা স্বয়ং আপন প্রাণশক্তির দিক দিয়ে ইসলামের প্রকৃত তাসাওউফ এবং তার ধরন 'ইহসান' থেকে কিছু পৃথক নয়। কিন্তু যা আমি পরিহার যোগ্য মনে করি তাহলো সেসব সূফীবাদী রহস্য ও ইশারা ইংগিত, সূফীবাদী ভাষা ব্যবহার এবং সূফীবাদী কর্মপদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতি চালু রাখা। প্রকাশ থাকে যে, প্রকৃত ইসলামী তাসাওউফ ঐ বিশেষ কাঠামোর মুখাপেক্ষী নয়। এটা ছাড়া তার জন্যে অন্য কাঠামোও সম্ভব। এর জন্যে ভাষাও অন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, রহস্য ও ইশারা ইংগিতও পরিহার করা যেতে পারে। তারপর পীরীমুরীদী এবং এ বিষয়ের সকল বাস্তব আকার প্রকার পরিহার করে অন্য আকার প্রকারও অবলম্বন করা যেতে পারে। সেই কাঠামোই অবলম্বন করতে পীড়াপীড়ি করা কি জরুরী? অথচ প্রাচীন কাঠামো এ জন্যে পরিত্যাজ্য ছিল এবং এখনো পরিত্যাজ্য যে বহু কাল যাবত ঐ কাঠামোতে জাহেলী তাসাওউফের তৎপরতা চলছে এবং তার বিপুল প্রচারণার ফলে মুসলমানদেরকে আকীদাগত ও নৈতিক ব্যাধিতে লিপ্ত করেছে।"

এভাবে "রেসালায়ে দীনিয়াতের" ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'তাসাওউফ' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা বলেন-

"ফেকাহর সম্পর্ক হলো মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে। সে শুধু দেখে যে তাকে যেমন এবং যেভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে তা সে করেছে কিনা। যদি তা করে থাকে ত ফেকাহ্‌র এ নিয়ে বলার কিছু নেই যে তার মনের অবস্থা কি ছিল। মনের অবস্থা সম্বন্ধে যে বস্তু আলোচনা করে তার নাম 'তাসাওউফ'। (এ সম্পর্কে তিনি টীকায় বলেছেন), কুরআনে এ বস্তুর নাম তায্‌কিয়া ও হিকমত। হাদীসে তার নাম দেয়া হয়েছে ইহসান। পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যে এ তাসাওউফ নামে অভিহিত হয়।

উপরোক্ত উধৃতিগুলো ছাড়াও আমি তাসাওউফ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা ইসলাহীর বিশের মতো প্রবন্ধাদি পড়েছি এবং দায়িত্ব সহকারে বলতে চাই যে, আমার যোগ্যতা অনুযায়ী বহু চিন্তা ভাবনা ও সমালোচনা ও গবেষণার দৃষ্টিতে পড়েছি। কিন্তু আমি এ দু'জন মনীষীর চিন্তাধারার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শাব্দিক মতপার্থক্য ছাড়া কোন মতপার্থক্য খুঁজে পাই নি। মূলনীতি থেকে শুরু করে যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতি ও সনদ উল্লেখ করণের ব্যাপারে উভয়ে একেবারে একমত।[১] এ শাব্দিক মতবিরোধও সহজেই দূর হতে পারে। তথাপি তা যদি

---

১. এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য বিষয়ে না হোক, কিন্তু تصور شيخ (শায়খ বা পীরের ধ্যান করা) এর বিষয়টিতে উভয়ের মধ্যে মতৈক্য নেই। কারণ মাওলানা মওদূদী تصورشيخ এর যে ব্যাখ্যাকে একস্থানে মুবাহ বলে মেনে নিয়েছেন, তাকে মাওলানা ইসলাহী একস্থানে ভ্রান্ত গণ্য করেছেন। কিন্তু এ সন্দেহ দু কারণে হতে পারে। এক এই যে- এ প্রসংগে সকল আলোচনা সামনে রাখা হয়নি এবং কোথাও কোথাও থেকে কোন বক্তব্য সামনে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এসব আলোচনা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং চিন্তাভাবনাসহ পূর্বাপর বক্তব্য সামনে রেখে দেখা হয়না।

যদিও মুহাক্কেক ওলামার মধ্যে কিছু বিষয়ের মতানৈক্য লক্ষ্য করা কোন আপত্তিজনক বিষয় নয়। তথাপি এ বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গেলে আমার চিন্তাগবেষণার দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা ইসলাহীর মধ্যে মতানৈক্য নেই। আমি যদি এ সংক্রান্ত সমুদয় আলোচনা নকল করি এবং তার গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি তা হলে তা এক দীর্ঘ প্রবন্ধের আকার ধারণ করবে এবং সকল পাঠকের তার প্রতি অনুরাগ নাও থাকতে পারে। এ জন্যে তার থেকে বিরত রইলাম। অবশ্য যাঁরা তাঁদের বিশেষ রুচির কারণে তা জানতে চান এবং তার উপর গবেষণা করতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে আমার পরামর্শ এই যে, তাঁরা তর্জমানুল কুরআন, মার্চ-মে, ১৯৫১, সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হাকিম আবদুর রশীদ সাহেবের প্রবন্ধে এর ব্যাখ্যা এবং মাওলানা ইসলাহীর দীর্ঘ পর্যালোচনা যেন পড়ে দেখেন।

অতঃপর ৭০ হিঃ সালের যিলকদ-যিলহজ্জ মাসের তর্জমানুল কুরআনে প্রকশিত

রয়ে যায় ত কোন ক্ষতি নেই। মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিকোণের সংক্ষিপ্তসার এই যে, তাসাওউফ পরিভাষা যদিও নবী ও সাহাবীদের যুগে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু পরবর্তী যুগে এ শব্দটি কত এমন সব বুযর্গানে দ্বীনের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আসছে যাঁদের নিকটে এ শব্দটি মতবাদ ও আমল উভয় দিক দিয়ে ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে তাযকিয়া, হিকমত, ইহসান প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ কথা সূফীগণের মধ্যেই সীমিত নয়, মুহাদ্দেসীন, মুফাস্‌সেরীন এবং অন্যান্য বহু ইল্‌মের ধারক বাহকদের নিকটে শত শত হাজার হাজার এমন সব প্রতিশব্দ পাওয়া যায় যার প্রচলন নবী ও সাহাবী যুগে ছিল না। কিন্তু হয়তো তা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সমুদ্র থেকে গৃহীত অথবা তাদের শব্দাবলীও দলিলাদির ভিত্তিতে গৃহীত এ জন্যে গোটা উম্মতের মধ্যে প্রচলিত ও সর্বজন বিদিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে অধঃপতনের যুগসমূহে তাসাওউফ শব্দের সাথে কিতাব ও সুন্নাতের পরিপন্থী দৃষ্টিভংগী ও আমলের সংযোগও হয়েছে। এ অবস্থা অন্যান্য সকল পরিভাষার সাথেও হয়েছে এবং ভ্রান্ত মস্তিষ্ক ও অন্যায়কারী ব্যক্তিগণ তার অর্থ কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। এতে করে প্রকৃত সত্যের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। মাওলানা ইসলাহীর দৃষ্টিকোণের সার সংক্ষেপ এই যে, ইহসান অর্থে তাসাওউফ শব্দের ব্যবহার

মাওলানা যফর আহমদ সাহেবের সে প্রবন্ধটি পড়ে দেখেন যাতে তিনি হাকিম সাহেবের ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করে অন্য এক ব্যাখ্যা পেশ করেন। এই সাথে মাওলানা মওদূদী তাঁর লিখিত পত্রে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা উভয় ব্যাখ্যার পটভূমি হিসাবে দেখতে হবে। তারপর মাওলানা ইসলাহী মাওলানা নোমানীর জবাব দিতে গিয়ে পীরের (تصور شیخ) সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন যা নবেম্বর ১৯৫১ সালের তর্জুমান সংখ্যায় প্রকাশিত, তা ভালো করে পড়ে দেখতে হবে। শেষে মাওলানা মওদূদীর বিস্তারিত লেখা পড়ে দেখতে হবে যা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়েছে। আমি আশা করি পাঠকবৃন্দ সে সিদ্ধান্তেই পৌঁছবেন আমি যেমন পৌঁছেছি। আসলে সন্দেহের কারণ হলো মাওলানা মওদূদীর সে সংক্ষিপ্ত অভিমত যা তিনি মাওলানা যফর আহমদ ওসমানীর কথার জবাবে ব্যক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তী বিশদ বর্ণনা সকল সন্দেহ দূর করে। এ জন্যে দ্বিতীয় লেখাটি পুস্তকাকারে রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম লেখাটি তর্জুমানুল কুরআনে রয়ে গেছে। এ বিষয়ে যাঁরা অন্যান্য ওলামা ও সূফীদের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে চান তাঁরা যেন মাওলানা হামেদ আলী সাহেবের সে প্রবন্ধ পড়ে দেখেন যা মাসিক যিন্দেগী রামপুর, মার্চ ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে যার কারণে অনেক সময়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে আলোচনা ও সমালোচনা চলাকালে এ শব্দটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এটা নিশ্চিত করা কঠিন হ'য়ে যায় যে আসলে এ 'তাসাওউফ' কোন্ বস্তুর নাম। এ অবস্থায় ভ্রান্ত ও সঠিক তাসাওউফের দু'টি প্রকার জরুরী হয়ে পড়ে। যেমন মাওলানা মওদূদীর উপরোক্ত উধৃতিতে "ইসলামের প্রকৃত তাসাওউফ", অথবা "সত্যিকার ইসলামী তাসাওউফ" এবং "জাহেলী তাসাওউফ" শব্দাবলী দেখা যায়। অতএব কেন এ শব্দকে বেদআতী পরিভাষা গণ্য করে তাকে "ইহসান" থেকে সম্পর্কহীন করে দেয়া হবে না? আমার মতো গোনাহগার প্রবন্ধকারের কথা এই যে অনেক সময় আমি মাওলানা ইসলাহীর দৃষ্টিকোণের প্রতি ঝুঁকে পড়ি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উভয় বুযর্গ সঠিক পথেই রয়েছেন এবং উভয়ের দৃষ্টিকোণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মাওলানা ইসলাহী এমন এক অভিযোগকারীর জবাব দিচ্ছিলেন যিনি 'তাসাওউফকে' দ্বীনের এক বিরাট বিভাগ গণ্য করে জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আকীদাহ ও আমলের দিক দিয়ে এ বিভাগ থেকে দূরে থাকার অভিযোগ করেন, কিন্তু তাঁর সমগ্র আলোচনা জাহেলী ও বেদআতী তাসাওউফকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, সে জন্যে তিনি বাধ্য হয়ে মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিভংগীকে এ ব্যাপারে নরম বলেন এবং পরিষ্কার বলে দেন যে, প্রচলিত তাসাওউফকে আমি বিদআত মনে করি এবং তার সাথে 'ইহসানের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। যাঁরা 'তাসাওউফ' ও 'ইহসানকে' এক মনে করেন, তারা ভ্রান্ত।

এ ছিল সেই কমতি যা ইসলাহী সাহেব পূরণ করেন। এখন আমি মাওলানা নোমানী সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মাওলানা মওদূদীর ফেলে রাখা কমতি এবং ইসলাহী সাহেবের তা পূরণ করাতে আপনার আপত্তি কি? আপনি ত একজন আলেমে দ্বীন। আপনি আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করে অপরের ত্রুটি তুলে ধরছেন না কেন? এমন গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌মী আলোচনায় (যা আপনার কথায় দ্বীনের একটি বিভাগ) দু একটি বাক্য বলেই সরে পড়লে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবেন কি?

মাওলানা নোমানী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে এও বলেন ঃ

"তাসাওউফ থেকে ফায়েদা হাসিল করার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এ যুগে সম্ভবতঃ আপনাদের। যে দাওয়াত এবং যে অভিযান নিয়ে আপনারা দাঁড়িয়েছেন,

তার কর্মীদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাওয়াক্কল, যে প্রেম ও প্রেমাসক্তি, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা, আখেরাতের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা, এবং মৃত্যুর কামনা বাসনা হওয়া প্রয়োজন, জড়বাদী এ যুগে এ গুণাবলী অর্জন করার পন্থা একমাত্র 'তাসাওউফ'। এমন তাসাওউফ যা আহ্‌লে হক ও আহলে সুন্নাত গ্রহণ করেন। আট দশ বছর থেকে এখন পর্যন্ত আপনাদের অভিজ্ঞতাকে যদি যথেষ্ট মনে করতেন, তাহলে কত না ভালো হতো।"

আমাদের বুযর্গানে দ্বীনের এ কি হলো যে, যখন তাঁরা অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাদের সম্পর্কে নিজেদের প্রতিক্রিয়া বয়ান করেন অথবা তাদেরকে কোন পরামর্শ দেন, তখন একটুও চিন্তা করেন না যে তাঁরা কি বলছেন? পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, যে তাসাওউফের সংজ্ঞা বলা হচ্ছে যে, একে আহলে হক ও আহলে সুন্নাত গ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীলগণ দশ বারো বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ অন্য কথায় আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের তাসাওউফ থেকে ও সব লোক একেবারে বঞ্চিত রয়েছেন, যারা হক ও সুন্নাত সংরক্ষণের জন্যে পনেরো বিশ বছর যাবত সংগ্রাম করছেন যার জন্যে তাঁরা তাঁদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত ওয়াক্‌ফ করে রেখেছেন। এমনকি এ পথে কঠিন থেকে কঠিনতর অগ্নি পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছেন এবং তাঁদের সেসব গুণাবলী, যা অর্জনের পন্থা শুধু তাসাওউফ বলা হয়েছে, তা পুরোপুরি লক্ষ্যণীয় হয়ে পড়ছে এবং তা সমগ্র দুনিয়ার সামনে আছে। খোদাই ভাল জানেন, অভিযোগকারীগণ কেন হেয়ালি ভাষায় কথা বলছেন এবং কোন্ সে মানসিকতা যার দরুণ তাঁরা এ ধরনের হেয়ালিপনায় লিপ্ত রয়েছেন? তাঁরা কি জামায়াত নেতৃবৃন্দকে আহ্‌লে হক ও আহলে সুন্নাত থেকে পৃথক মনে করেন অথবা তাঁদের ধারণা কি এই যে আহলে হক ও আহলে সুন্নাত তারা ত বটে, কিন্তু দ্বীনের একটি বিভাগ থেকে তারা সরে পড়েছে এবং তার কারণ তাদের এ বিষয়ে অজ্ঞতা? যদি প্রথমটি হয়, তাহলে এর চেয়ে সুস্পষ্ট বুহতান (বানোয়াট অভিযোগ) আমরা ধারণা করতে পারি না। আজ এ দুনিয়ায় তাঁদের কলম ও মুখ বন্ধ করারকোন উপায় আমাদের নিকটে নেই। কিন্তু যখন তাঁরা আখেরাতে মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের দরবারে ঐ বুহতানের জবাবদিহির জন্যে দাঁড়াবেন, তখন তাঁরা টের পাবেন যে এ বানোয়াট মিথ্যা অভিযোগের যথার্থ শাস্তি কি। আর ব্যাপার যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে তাঁদের প্রবন্ধাদিতে-এমন কি তাঁদের

ফতুয়ায় এমন একটি বাক্যও পাওয়া যায় না-যার দ্বারা তাসাওউফ সম্পর্কে জামায়াত নেতাদের অজ্ঞ থেকে জ্ঞাত এবং অনুরাগহীন থেকে অনুরাগীর হওয়ার সুযোগ হতে পারতো।

পাঠকবৃন্দ মাওলানা মনযূর নোমানী সাহেবের প্রবন্ধটি যদি দেখেন যার পর্যালোচনা হচ্ছে তাহলে তাঁরা স্বয়ং জানতে পারবেন যে তার মধ্যে কোথাও একটি শব্দও এমন নেই যার দ্বারা আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের গৃহীত তাসাওউফের বিশদ বিবরণ ত দূরের কথা তার যৎসামান্য পরিচয়ও লাভ করা যেতে পারে। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করুক, "যদি জামায়াত নেতৃবৃন্দ নিজেদের সংগ্রাম সাধনায় এমন এক বিষয়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করছে যা এ পথে জরুরী এবং তাদের এ অবহেলার কারণ তাদের অজ্ঞতা, তাহলে আপনি আপনার প্রবন্ধে সে অবহেলা ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য কি করেছেন?"

তথাপি প্রকৃত ঘটনা এই যে, মাওলানা নোমানী সাহেবের দৃষ্টিতে যে সব গুণাবলী শুধু তাসাওউফের পথেই অর্জন করা যেতে পারে, তা অর্জনে তাসাওউফ থেকে একেবারে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আলহামদু লিল্লাহ জামায়াত নেতৃবৃন্দ কারো পেছনে নেই। বরঞ্চ আমি আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার মনে অযথা কারো প্রতি মহব্বত ও সমর্থন এবং কারো প্রতি অযথা বিরোধিতা ও শত্রুতার সামান্যতম আবেগ থেকে দূরে থেকে পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে বলছি যে, সূফী না হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে সব সূফীসুলভ গুণাবলীতে গুণান্বিত তার দশ ভাগের এক ভাগও অভিযোগকারী ও বিরোধিতাকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

মাওলানা নোমানী সাহেবের দুঃখ এই যে মাওলানা মওদূদী এ যাবত ত সূফী ছিলেনই না, এখন কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পরেও যদি সূফী হতেন তাহলে ভালো হতো। আমি বলি যে, যে দিন থেকে তিনি ইসলামের সমর্থনে ও তার সংরক্ষণের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যে দিন থেকে দাওয়াতী ময়দানে নেমে পড়েন-সে দিন থেকেই তিনি সূফী। তার পর থেকে সর্বদা তিনি রাহে সলুক অতিক্রম করে চলেছেন। মর্যাদার সঠিক নির্ধারণত আলীম ও খাবীর আল্লাহ তায়ালাই করতে পারেন। কিন্তু যা কিছু আমাদের মতো বান্দাহদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে তা বয়ান করতে কোন ভয়ের কারণ নেই যে মাওলানা মওদূদী নিছক সাহেবে কাল সূফী নন, যিনি কোথাও কোন খানকার নিভৃত কক্ষে বসে 'আল্লাহু' জপ করছেন অথবা শুধু মুখ ও কলম ব্যবহার করছেন, বরঞ্চ তিনি

সাহেবে হালও যে মর্দে মুজাহিদ হ'য়ে ময়দানে তাঁর কথাকে কার্যে পরিণত করছেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

-হো জেসকি রগ ও পায় মে ফকৎ মস্তিয়ে কিরদার- (যার শিরা-উপশিরায় থাকে শুধু কর্মতৎপরতার উন্মত্ততা)। মাওলানা নোমানী সাহেব মাওলানা মওদূদীর প্রতি তাসাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞতার দোষ চাপিয়েছেন। হতে পারে নোমানী সাহেবের তাসাওউফ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু মাওলানার তাসাওউফ সম্পর্কে নোমানী সাহেব ত একেবারেই অজ্ঞ। এখন তিনি (নোমানী সাহেব) মাওলানা মওদূদীকে তাঁর তাসাওউফ সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করুন বা না করুন, আমরা ত আপন কর্তব্য মনে করে মাওলানা মওদূদীর তাসাওউফ তাঁর সামনে পেশ করার চেষ্টা অবশ্যই করব।

একটি প্রবন্ধ লেখার পরিবর্তে যদি একটি বিস্তারিত গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা থাকতো তাহলে আমরা বিশদ আলোচনায় যেতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নিজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হচ্ছি এবং আশা করি যে আল্লাহর ফযল হলে পাঠকদের এটাই যথেষ্ট হবে।

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيق

মাওলানা মওদূদী যে দাওয়াত ও অভিযান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সূচনা স্বয়ং মাওলানার কথায় ১৯৩৩ ঈসায়ী সালের সে সময়ে হয় যখন তিনি হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে তর্জুমানুল কুরআন প্রকাশ করেন। মাওলানার নিজের ভাষায় ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পূর্ণ নয়টি বছর বিশুদ্ধ সমালোচনা এবং তবলীগ ও তালকীনের স্তর ছিল। এ সময়ে মাওলানার মধ্যে যে সব গুণাবলী লালিত পালিত হয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছিলো তা অনুমান করার জন্যে আমরা তাঁর লেখার কিছু উধৃতি এখানে পেশ করছি। তর্জুমানুল কুরআন প্রকাশিত হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলে মাওলানা বলেন-

"তর্জুমানুল কুরআন আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলো। এখন তার দ্বিতীয় বছর শুরু হচ্ছে। এ সময়কালে আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও তাঁর কিতাবের খেদমতের জন্যে যে তাওফিক আমাকে দান করেন এবং কঠিন সাহস হারা অবস্থায় খেদমতের জন্যে পদ্ধপরিকর থাকার যে অবিচলতা দান করেছেন তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমার ফরয যদিও আমার

শোকর তাঁর ফযল ও দানের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। আমি যে সব অবস্থার মধ্যে এ পত্রিকাটির সম্পাদনা ভার গ্রহণ করি এর পরে ক্রমাগত কয়েক মাস যেসব অসুবিধার সম্মুখীন আমি হই তার ফলে অবশ্যই আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহস হারিয়ে ফেলতাম যদি আমার আস্থা খোদার পরিবর্তে পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং স্বয়ং আমার আপন শক্তির উপর হতো। কিন্তু খোদার শোকর যে, আমার ভরসা গোটা দুনিয়া ও তার উপায়-উপকরণের উপর নয় বরঞ্চ সর্বদা খোদার উপরেই ছিল এবং খোদার এ সত্য ওয়াদা রয়েছে যে, যে তাঁর উপর ভরসা করে তাঁর পথে সবর ও অবিচলতাসহকারে চেষ্টা করে যাবে, সে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হবে এবং ভয় ও দুঃখ কষ্ট তাকে স্পর্শ করবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ .

(তর্জুমানুল কুরআন, মহররম-১৩৫৩ হিঃ)

দ্বিতীয় বছর শেষে মাওলানা বলেন-

"এ মাস থেকে তর্জুমানুল কুরআনের তৃতীয় বছর শুরু হচ্ছে। প্রথম বছর বড়ো দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে শেষ হলো। দ্বিতীয় বছরে আল্লাহর অনুগ্রহ খানিকটা সচ্ছল অবস্থার সৃষ্টি করে। এখন তৃতীয় বছরে আবার দুঃখ কষ্টের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সচ্ছল অথবা অসচ্ছল সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রয়েছে এবং ভরসার যোগ্যই তিনি। তিনি তাকীদ সহকারে বলেছে فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً –اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

– এ জন্যে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অসচ্ছলতা বা দুঃখ কষ্টের মধ্যে যদি আমরা খেদমতে অবিচল থাকি এবং খোদা ছাড়া অন্য কাউকে মুস্তায়ান ও মুজিবুদ্দাওয়াত না বানাই, তাঁর ফযলের উপর ভরসা রাখি তাহলে পরিণামে পুনরায় তাঁর রহমত সচ্ছলতাসহ আমাদের সাথী হবে। আমরা জানি এই যে সুখ ও দুঃখ, দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা এর আবর্তন বিবর্তন হয় আমাদের পরীক্ষার জন্যে।

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

এ আমাদের সবরের পরীক্ষা, আমদের আল্লাহর উপর তাওয়াক্কালের পরীক্ষা এবং এ বিষয়ের পরীক্ষা যে, আমাদের মনে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর দ্বীনের খেদমতের প্রেরণা সত্য না তার মধ্যে কোন ভেজাল মিশ্রিত আছে। খোদার কাছে এ দোয়া করি, এ পরীক্ষায় যেন তিনি আমাদেরকে উত্তীর্ণ হওয়ার তওফিক দান করেন এবং শেষে যেন আমাদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দেন যা সবরকারীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হয় وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ . এবং তাঁর ফযল দ্বারা সফলতার সে দ্বার আমাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন যা আমাদের চিন্তার অতীত।

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ على اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

তার পর মাওলানা বলেন-

মুসলমান জাতির অবস্থা বর্তমানে এক অনুর্বর ভূমির মতো হয়ে পড়ছে। তার মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের বৃক্ষাদি খুব বাড়ে ও ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধরনের বৃক্ষ বর্ধিত ও বিকশিত হতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে বহু কল্যাণ ও সংস্কারের বীজ ত জমিতেই বিনষ্ট হয়ে গেল। কোনটা অংকুরিত হলেও তার মূল বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

এ অবস্থা সম্বন্ধে আমি স্বয়ং অবহিত ছিলাম এবং যখন আমি এ কাজ শুরু করি তখন আমার শুভাকাংখীগণ আমাকে এই বলে নসিহত করেন যে, অনুর্বর জমিতে বীজ ফেলে তা নষ্ট করোনা। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে মর্দে মুমেনের কাজ এ নয় যে, জমির দুরবস্থা, মওসুমের অনুপযোগিতা এবং পানির স্বল্পতা দেখে হিম্মৎ হারিয়ে ফেলবে। তার এ জন্যে অনাদি কাল থেকে এ ভাগ্যই লিখে রাখা হয়েছে যে সে অনুর্বর জমিতে হাল চালাবে, তার অনুর্বরতা ও চাষের অনুপযোগিতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আপন গায়ের ঘাম দিয়ে এবং সম্ভব হলে তাজা খুন দিয়ে তাকে সিক্ত করতে হবে এবং ফলাফলের পরোয়া না করে বীজ বপন করতে হবে। যদি জমি তার প্রচেষ্টায় সিক্ত ও উর্বর হয়, তাহলে সাফল্য ত নিশ্চিত কিন্তু সে যদি এ অনুৎপাদনশীল জমিতে সারা জীবন নিষ্ফল পরিশ্রম করতে থাকে এবং অবশেষে একদিন এ কাজেই জীবন দিয়ে দেয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে সে বিফলকাম নয়। তার জন্যে এ সাফল্য কি কম যে, যে কাজ সে

ফরয মনে করতো তার জন্যে সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল ছিল এবং ব্যর্থতা তাকে তার কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখতে পারেনি ? এমন ব্যর্থতার জন্যে সে অসংখ্য সাফল্য বিসর্জনীয় যা একটি বিকৃত যুগের ভংগীতে চলার, নিকৃষ্ট বিষ বৃক্ষাদির লালন পালন ও তার বিষাক্ত ফল বিক্রয়ের দ্বারা অর্জন করা যায়।

এ অবস্থায় যে ব্যক্তিকে কাজ করতে হয় তাকে ত সর্বোতভাবে শুধু খোদার সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর ভরসা রাখা উচিত। কারণ যে জাতির বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করছে তার থেকে কোন সাহায্যের আশা করা যায় না। আর যদি কিছু নেকদেল লোক সে পেয়েও যায় তথাপি তাদের সাহায্যের উপর আস্থা রেখে কোন বিরাট কাজ করা যায় না। (তর্জুমানুল কুরআন-মুহররম, ১৩৫৪, ১৯৩৬ ইং)।

দেখুন এখানে "অনুৎপাদনশীল জমিতে সারা জীবন ব্যর্থ পরিশ্রম করার" কথা প্রকাশ করে তিনি এ কথা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং একীন ও তাওয়াক্কুলের সাথে তাঁর মধ্যে খোদাপ্রেম ও প্রেম উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যদি এ সম্পর্কে অবহিত না থাকেন, তাহলে সর্বপ্রথম আপনি আপনার এ বেখবর হওয়ার খবর নিন। তার পরই আপনি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার যোগ্য হবেন। নতুবা এ কি তামাশা যে, আজ আপনি যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের গৃহীত তাসাওউফ থেকে বঞ্চিত ও অজ্ঞ থাকার অভিযোগ করছেন যার মধ্যে বিশ বছর পূর্বেই সে সব গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে ছিল যা আপনার দৃষ্টিতে তাসাওউফের পথেই সৃষ্টি হতে পারে?

তর্জুমানুল কুরআনের তৃতীয় বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মাওলানা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন ঃ

"তর্জুমানুল কুরআন প্রকাশিত হওয়ার পর তিন বছর অতীত হলো এবং এখন তার চতুর্থ বছর শুরু হচ্ছে। এ সময়ে আল্লাহর অনুগ্রহে যে সব নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে তার শুকুরিয়া আদায় করা আমার প্রথম কর্তব্য। প্রথমত এ অনুগ্রহই কি কম যে একজন নগণ্য গোনাহ্গার বান্দাহকে দ্বীনে হকের জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে? অবশ্য নির্বাচনের কারণ যদি ইলম, তাকওয়া, ইখলাস, জাহেরী ও বাতেনী কামালিয়াত হতো তাহলে আমি হয়তো শেষ ব্যক্তি হতাম যার উপর এ নির্বাচনের দৃষ্টি পড়তো। অতঃপর এ ব্যাপারে অতিরিক্ত অনুগ্রহ এই যে, আমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি তিনি তাঁর মেহেরবানীতে শুধরে দিয়েছেন।

জ্ঞানহীন ছিলাম জ্ঞানের জ্যোতি দান করেছেন। পথ জানা ছিল না, সৎ পথের দিকে হেদায়েত দান করেছেন। দুর্বল ও সাহসিকতাহীন ছিলাম, ধৈর্য, সহনশীলতা ও অবিচলতার শক্তি দান করেছেন। উপায় উপকরণহীন এবং বন্ধু ও সহযোগীহীন ছিলাম, অদৃশ্য ভান্ডার থেকে প্রতি পদে পদে উপকরণ সরবরাহ করেছেন। প্রত্যেক কঠিন কাজ এমন এমন পদ্ধতিতে সহজ করে দেন যে আমার চিন্তা তদবিরের কিছু করারই ছিল না। এত সব এমন দয়া অনুগ্রহ যা আমি জানি এবং তার শুকরিয়া আদায় করা আমার সাধ্যের অতীত। এখন রইলো যে অসংখ্য দয়া অনুগ্রহ যা আমার জানা নেই, তার শুকুরিয়া কিভাবে আদায় করব?

কিন্তু হক তায়ালা যেমন তাঁর দয়া অনুগ্রহ বিতরণে অত্যন্ত উদার, এ বান্দাহ তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের জন্যে তেমনি লোভী। তিনি যা দিয়েছেন তার জন্য অবশ্যই শুকরিয়া কিন্তু তাতে তৃপ্ত নই। খোদার শুকরিয়ায় পরিতৃপ্তি আবার কেমন? তাঁর ধনী হওয়ার গর্ব আছে ত বান্দাহরও দরিদ্র হওয়ার গর্ব আছে। তাঁর দয়া অনুগ্রহ সীমাহীন, ত বান্দাহর মুখাপেক্ষিতাও সীমাহীন। তিনি দান করতে ক্লান্ত হন না, ত বান্দাহ্ চাইতে কেন ক্লান্ত হবে? আর তাঁর কাছে চাইবেনা ত কার কাছে চাইবে? আমি জ্ঞান পিপাসু। এ পিপাসা দূর করার তিনি ছাড়া আর কে আছে? আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি। তা দূর করার কেউ থাকলে একমাত্র তিনি। আমার মন অশান্ত। আমার আত্মা উদ্বিগ্ন। আমার মস্তিষ্ক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত। একমাত্র খোদাই এ রোগ দূর করতে পারেন। আমি গোনাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমার আমলে বহু ত্রুটি আছে। আমার স্বভাবের দুর্বলতা পদে পদে আল্লাহর ইচ্ছা মতো চলতে বাধা দেয়। খোদা ছাড়া আর কেউ নেই যে আমার এ সব দোষ সংশোধন করতে পারে এবং নেক আমলের তওফিক দিতে পারে। আমি তাঁর কাছে নিয়তের ইখলাস কামনা করি। সঠিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করি। اَلْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ للهِ এর তওফিক চাই। আমি তাঁর কাছে এ দোয়া করি যেন তিনি আমাকে বান্দাহর মুখাপেক্ষীহীন করে শুধু তাঁর মুখাপেক্ষী করেন। ভালোবাসা, ভয় ও লোভলালসার সম্পর্ক সকলের থেকে ছিন্ন করে শুধু তাঁর সাথেই যুক্ত করে দেন। আমাকে এতোটা শক্তি যেন দান করেন, যাতে আমি ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের জন্যে মনের সকল সাহস দেখাতে পারি।

(তর্জুমানুল কুরআন মহররম ১৯৫৫)

পাঠকবর্গের নিকটে আমার আবেদন, উপরের উধৃতি একাধিকবার পড়ুন যাতে তার প্রতিটি শব্দে তায়াল্লুক বিল্লাহ ও তাওয়াককুল আলাল্লাহ্‌র যে উচ্ছাস ও ভাবাবেগ পাওয়া যায় তা যেন মনমগজে স্থান লাভ করে। জানিনা নোমানী সাহেব কোন্ ধরনের তাসাওউফের প্রত্যাশী। আমাদের দৃষ্টিতে ত আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের তাসাওউফ এটাই। খোদা যেন আমাদেরকে এ তাসাওউফ লাভের সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

তর্জুমানুল কুরআনের চতুর্থ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মাওলানা বলেন-

"এ সংখ্যার সাথে সাথে তর্জুমানুল কুরআনের পঞ্চম বছর শুরু হচ্ছে। সফরের এ নতুন মনযিলে পদার্পণ করার পূর্বে আল্লাহর শোকর আমার উপর ওয়াজেব। অতীত যুগ এভাবে অতিবাহিত হতে থাকে যে, প্রত্যেক বছরের শুরুতে আশংকা হচ্ছিল যে হয়তো এ পত্রিকাটি সারা বছর চলতে পারবে না এবং বছর শেষে বিস্মিত হতাম যে এ কি করে বেঁচে রইলো। চড়াই উৎরাইয়ের এ ক্রমাগত অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহর সাহায্যের একটির পর একটি বহিঃপ্রকাশ মনের মধ্যে এক বিশ্বাস সৃষ্টি করে ছিল যে এ খেদমত আল্লাহর দরবারে কিছুটা কবুল হয়েছে এবং এ কবুল হওয়ার কারণে তার সাথে يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *এর আচরণ হচ্ছে। যদিও বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে বাইরে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। এখনও যমানার সে রূপই আছে যা দেখে দেখে মন ভেঙে যেতো এবং হিম্মৎ হারিয়ে যেতো। উৎসাহ-উদ্যম দমিত হতো। কিন্তু ভেতরের সে অবস্থা এখন আর নেই। এখন মন নিশ্চিন্ত। আত্মায় রয়েছে প্রশান্তি। উৎসাহ-উদ্দীপনায় এক নতুন শক্তির উত্থান এবং সংকল্পের মধ্যে এক বিশেষ আস্থা শক্তি অনুভব করি। প্রথমে সবর ও তাওয়াক্কুল শব্দদ্বয় মনের মধ্যে ছিল। আত্মার মধ্যে এ দু'টির অর্থের নিশ্চিতকরণ শুরু হয়েছে। প্রথমে আকীদার দিক দিয়ে মনে করতাম যে খোদার উপর ভরসা করা উচিত। চার বছরের অনুশীলনের পর এখন কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি যে, খোদার উপর ভরসা করার অর্থ কি এবং তার উপর নির্ভরশীলদের প্রতি কি আচরণ করা হয়। এইটাই সেই নিয়ামত বছরের পর বছর ধরে যার প্রত্যাশী ছিলাম। এখন সে দানের সূচনা হয়েছে। গভীর আন্তরিকতাসহ দাতার শুকরিয়া আদায় করছি এবং সেই সাথে এ দোয়াও করি যে, সে নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়া হোক। কারণ এখন যে অবস্থা সামনে আসছে, তার জন্যে সেই বস্তুরই প্রয়োজন। আমি এক

---

* আর তাকে এমন উপায়ে রিয্ক দিবেন, যেদিক সম্পর্কে তার ধারণাও হবেনা- (অনুবাদক)।

মুজাহিদসুলভ ঈমান চাই। এমন মন চাই যা সমুদ্রের বাত্যাপীড়িত উত্তাল তরংগের মুকাবেলায় ভাঙা নৌকা নিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে অগ্রসর হয়। এমন আত্মা চাই যে পরাজয় বরণ করার এবং আত্মসমর্পণ করার ধারণাই করতে পারে না। এমন দৃঢ় সংকল্প চাই যা বস্তুগত সহায়-সম্বল থেকে মুখাপেক্ষীহীন হবে এবং সকল সহায় ছিন্ন হলেও তা ভেঙে যাবে না। এমন ইচ্ছা শক্তি চাই যাকে কোন শক্তি তার লক্ষ্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

(তর্জুমানুল কুরআন -মহররম ১৩৫৬ হিঃ)

পাঠকবর্গের নিকট আবেদন জানাই তারা যেন উপরোক্ত উধৃতির "প্রথমে সবর ও তাওয়াক্কল শব্দদ্বয় থেকে......নির্ভরশীলদের প্রতি কি আচরণ করা হয়" অংশটুকুর প্রতি একটু গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। কারণ মাওলানা নোমানী সাহেবের যে প্রবন্ধের আমি পর্যালোচনা করছি, তার মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছেন-

"দুনিয়ায় কিছু মর্মকথা এমন আছে যা শব্দের অর্থ জানলেই হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু যখন স্বয়ং তা মানুষের ভাগ্যে জুটে যায় অথবা অন্য কোন জীবিত সত্তার মধ্যে মানুষ তা দেখতে পায় তখন সে কিছুটা বুঝতে পারে। যেমন একীন, তাওয়াক্কল, তাসলিম, রেযা ও তাফবিজ (ক্ষমতাহস্তান্তর)-এসব দ্বীনী মর্মকথা। এসবের উপর দ্বীনের পূর্ণতা নির্ভরশীল। কিন্তু যখন পর্যন্ত এসব মর্মকথার কিছু জানা না গেছে অথবা আল্লাহর কোন বান্দাহর জীবনে সুস্পষ্টরূপে মানুষ এসব অবস্থা না দেখেছে ততোক্ষণ তার আভিধানিক অর্থ জানা সত্ত্বেও তার প্রকৃত মর্মকথা উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু তার এ বঞ্চনার অনুভূতি তখন হয় যখন আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করে। অথবা আল্লাহর কোন বান্দাহর মধ্যে এসব মর্মকথা স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন তার মনে হয় যে এ সব শব্দের উদ্দেশ্য বুঝতে তার উপলব্ধি শক্তি কত দুর্বল ছিল"- (তার প্রবন্ধ পৃঃ ১৮, ১৯)।

মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা নোমানীর বক্তব্য পাশাপাশি রেখে দেখার পর আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, যদিও জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু মর্মকথা স্বচক্ষে দেখা যেতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু এমন সব মর্মকথা যা শব্দার্থ জানার পর উপলব্ধি করা যায় না তার জন্যে সে পথে চলা জরুরী-যা খোদা তাঁর বান্দাহদের জন্যে খুলে দিয়েছেন। এ পথের পথিকই

(মালেক) তার মানসিক শব্দাবলীর অর্থ তার আত্মার মধ্যে সত্য বলে প্রমাণিত করতে পারে এবং বলতে পারে যে, "আকীদার দিক দিয়ে যা আমি মানতাম, এ পথ অতিক্রম করার দরুণ, বাস্তবে তা বুঝতে পারছি। যদি একজন একামতে দ্বীনের সংগ্রামে একনিষ্ঠার সাথে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে পথের কর্মতৎপরতা ও তার অভিজ্ঞতা সে সব মর্মকথা সে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করতে পারবে যার জন্যে শব্দার্থ জানা যথেষ্ট হয় না। নতুবা সে জীবন ভর জীবিত সত্তাদের মধ্যে স্বচক্ষে দেখুক অথবা আপনা আপনি জানার প্রতীক্ষায় থাকুক, সে ভাগ্যহীনই রয়ে যাবে।

সমালোচনা, তবলিগ ও তালকীন-এর গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী ক্রমাগত রাহে সলুক অতিক্রম করে চলছিলেন। এমন সময় ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে এ ভূখন্ডের প্রখ্যাত সূফী বুযর্গ আল্লামা ইকবাল মাওলানা মওদূদীকে আহ্বান জানান এবং এ কাজের জন্যে পাঞ্জাবে আসার অনুরোধ করেন। অতএব সে "মজনু" তাঁর ডাকে লাব্বায়িক বলেন এবং তার দাওয়াত কবুল করে আপন ঘরদোর, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধব ছেড়ে দেড় হাজার মাইল দূরে গিয়ে এক নিভৃত পল্লীতে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে থাকতে লাগলেন। কিন্তু তিনি এদিকে এলেন আর ওদিকে তাঁর সবচেয়ে বৈষয়িক সহায় 'ইকবাল' দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। এ ছিল ধৈর্য সহনশীলতা ও অগ্নি পরীক্ষার এক বুক ভাঙা দুর্ঘটনা। কিন্তু সূফীর প্রকৃত সহায় যে-ই হয় সে সকল উপায়-উপকরণের মালিক ও তা সরবরাহকারী। অতএব এ সময়ে তর্জুমানুল কুরআনে যা কিছু লেখা হয়েছিল তা একবার পড়ে দেখা যাক। মাওলানা বলেন-

"শান্ত ও নিরাপদ পটভূমি থেকে টেনে বের করে সমুদ্রের তরংগের মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ করা হলো। সেই কল্পিত ভাঙা নৌকা আমাকে দেয়া হলো যার কাষ্ঠফলকগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যার পাল ছিন্নভিন্ন। সবচেয়ে বড়ো বৈষয়িক সহায় যার সাহায্য আশা করা যেতো সে সহায় ছিলেন ইকবাল। এখানে পদার্পণ করার সাথে সাথে তাঁকেও কেড়ে নেয়া হলো। যখন আপন শক্তির দিকে তাকাই ত শূণ্য দেখতে পাই। দু'চার সংগী সাথী যা পেয়েছি তাঁদের দিকে তাকালে আমার চেয়েও অধিক দুরবস্থায় দেখতে পাই। অপরদিকে সে অবস্থা নজরে পড়ে যা দেখে সাইয়েদুনা হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِيْنَةً وَ اَمْوَالاً فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ

এখন খোদা ব্যতীত আর কোন সহায় নেই। সকল বৈষয়িক সহায় মিথ্যা ও অনির্ভরযোগ্য। তিনিই প্রকৃত সহায়, সকল শক্তির উৎস, সকল উপায়-উপকরণের মালিক, তিনিই সহযোগিতা ও সাহায্যকারী عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۔

(তর্জুমানুল কুরআন, মুহররম-১৩৫৭)।

তর্জুমানুল কুরআনের ষষ্ঠ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর মাওলানা বলেন ঃ

"এ সংখ্যা থেকে তর্জুমানুল কুরআনের জীবনের সপ্তম বছর শুরু হচ্ছে। এ সালের সূচনাও আমি করছি দুনিয়ার মালিকের প্রশংসাসহ যাঁর দয়া-অনুগ্রহে এখন পর্যন্ত এ নগণ্য খেদমত চালু রাখার শক্তি আমার হয়েছে। আল্লাহু আকবর! এ দানের কি কোন সীমা আছে যে সহায় সম্বলহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন এক ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে অনুভূতিহীনতা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কোন্দল ও দলাদলির এবং নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের এ যুগে এ ধরনের তিক্ত ও নিরপেক্ষ একটি পত্রিকা পূর্ণ ছ'বছর প্রকাশ করতে থাকে এবং এ সময়ের মধ্যে তাকে কোন মানুষের করুণাপ্রার্থী হতে হয়নি? اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ- এটা কারো জন্যে ত বিশ্বাসগত বস্তু হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার জন্যে বহু বছরের পরীক্ষিত যাঁচাই বাছাইকৃত মর্মকথা। আমি ত তা এভাবে জানি যেমন কেউ চোখে দেখা জিনিস জানে। প্রথম দিন থেকে আমি আমার রব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আসছি, তেমনি তাঁকে পেয়েছি (তার জন্যে কুরবান হ'য়ে যাই) এবং বরাবর পেয়ে যাচ্ছি। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টিপ্রার্থী হতে দেন নি। তাঁর রাগ ব্যতীত অন্য কারো রাগে ভীতসন্ত্রস্ত হ'তে দেন নি। তাঁর দুয়ার ব্যতীত অন্য কারো দুয়ারের দিকে একজন মুখাপেক্ষীর দৃষ্টি দিয়ে দেখার সুযোগ আসতেও দেননি। তিনি জিজ্ঞেস করেন – اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহর জন্যে যথেষ্ট নন)। আমি খালেস দেলে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম, হ্যাঁ তুমিই আমার জন্যে

যথেষ্ট। সে সত্য আমার জন্যে যথেষ্ট হয়েছিল। এমন যথেষ্ট হ'য়েছিল যে আমার সম্মান রাখার দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেন। তিনিই যে আমার জন্যে যথেষ্ট এবং পরিপূর্ণরূপে যথেষ্ট তার বাস্তবরূপ আমি হায়দবাদের নিভৃত জীবনেও দেখেছি এবং পাঞ্জাবের এই যাযাবর জীবনেও দেখছি। তাহলে কেন আমার মন তাঁর কৃতজ্ঞতা বিহ্বল হয়ে পড়বেনা? কেন আমি রবের প্রতি খারাপ ধারণা করে তাঁকে ছেড়ে অন্যের সন্তোষপ্রার্থী হবো?"

পাঠকবৃন্দ! আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখুন একটি বিশ্বাসযোগ্য বস্তু বহু বছরের পরীক্ষিত ও যাঁচাইকৃত সত্য কিভাবে হয়ে পড়ে এবং সে কোন্ বস্তু যার দ্বারা এমন মর্মকথাও চোখে দেখা মর্মকথায় পরিণত হয় যা শব্দার্থ জানার পর উপলব্ধি করা যায় না? অথচ এ মর্মকথাগুলো জীবিত সত্তাগুলোর মধ্যে স্বচক্ষেও দেখা যায় নি।

মাওলানা আরও বলেন ঃ

"এ পত্রিকাটির উন্নতিকল্পে আমার মনে বহু আশা আকাংখা রয়েছে। যে পদ্ধতিতে এ প্রকাশিত হচ্ছে- তাতে আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। আমি চাই যে, এ একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হোক। চিন্তা ধারণার মুখ জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিক। চিন্তার পরিশুদ্ধি, আলোকচ্ছটা ও বিনির্মাণ খাঁটি ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে করা হোক। ইসলামকে একটি প্রাচীন স্থবির স্মরণীয় বস্তু বানিয়ে রাখা হ'য়েছে। তাকে এ পত্রিকা একটি সর্বজনবিদিত জীবন্ত ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী জীবন বিধান হিসাবে যেন পেশ করে। উন্নতমানের গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা দুনিয়ার বুক থেকে এক একটি গোমরাহী যেন নির্মূল করে এবং গভীর গবেষণাসহ জীবনের এক একটি সমস্যার ইসলাম অনুযায়ী সমাধান পেশ করে। এ আকাংখা আমি মনের মধ্যে পোষণ করে আসছি এবং ছ'বছর যাবত শরীরের সকল শক্তি তা অর্জন করার জন্যে ব্যয় করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি একাকী এবং শূণ্যহস্ত। আমার শক্তি সীমিত, আমি উপায় উপকরণহীন। যা করতে চাই তা করতে পারছি না। সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তা বিরল। কোটি কোটি মুসলমানের এ ভূখন্ডে আমি নিজেকে অপরিচিত মনে করছি। যে উন্মাদনায় আমি উন্মত্ত, তার জন্যে কোন মজনু খুঁজে পাচ্ছি না। বহু বছর যাবত যাদের নিকটে আমার চিন্তাধারা পৌঁছাচ্ছি তাদের নিকটে যখন যাই, তখন তাঁদেরকে আমার থেকে অনেক দূরে দেখতে পাই। তাদের চিন্তাচেতনা আমার চিন্তাচেতনা থেকে পৃথক। তাদের অনুরাগ

আসক্তি আমার থেকে পৃথক। তাদের আত্মা আমার আত্মার কাছে অপরিচিত। তাদের কান আমার ভাষার কাছে বধির। এ দুনিয়া অন্য কোন দুনিয়া- যার সাথে আমার স্বভাব প্রকৃতি পরিচিত নয়। যা কিছু এখানে হচ্ছে, যে সব দৃষ্টিভংগী, আবেগ উদ্দেশ্য এবং যে সব মূলনীতির ভিত্তিতে হচ্ছে সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা বুলন্দ করতে আমি বাধ্য। আমি সে সবের কিছু অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং কিছু অংশের সমর্থক নই; বরঞ্চ সমগ্রটির বিদ্রোহী। আমি সংশোধন চাই না, বরঞ্চ আধুনিক জীবনের গোটা প্রাসাদ ভেঙে ফেলতে চাই এবং তার স্থলে খাঁটি ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এক নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। এ পূর্ণ ও সার্বিক বিদ্রোহে কাউকে আমার সাথী পাচ্ছি না। সব দিকে আমি আংশিক বিদ্রোহী পাচ্ছি যারা এ প্রতিমাগৃহের কোন না কোন প্রতিমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ। প্রত্যেকের দাবী এই যে, সব প্রতিমা ভেঙে ফেলা হোক শুধু আমার প্রতিমার দিকে যেন তাকিয়ে দেখা না হয়।' এ অবস্থায় আংশিক বিদ্রোহী কোন এক পর্যায়ে পৌছার পর আমার থেকে আলাদা হ'য়ে যাবে। যারা সকল দিক দিয়ে বিদ্রোহী শুধু তারাই আমার সাথী হতে পারে। তারা বিরল। তাদেরকে না পেলে আমার সীমিত উপায় উপকরণ ও সীমিত শক্তি নিয়ে সীমিত পরিসরে একাকী যতোটুকু করতে পারি তাই করতে থাকব। কোন কোন সময়ে এ পরিস্থিতি দেখার পর আমার মানবসূলভ দুর্বলতা আমার মন ভেঙে দিতে থাকে। কিন্তু যখন সে আওয়াজ আমার কানে পৌছে যার দ্বারা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা মহান মুসলমান তাঁর গিরিগহবরের সাথীকে সান্তনা দানে উৎসাহিত করেন তখন আমার মনে নিভে যেতে থাকা আগুন পুনরায় প্রজ্জলিত হ'য়ে ওঠে- لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

(তর্জুমানুল কুরআন- মার্চ ১৯৩৭)।

উধৃতি দীর্ঘ হচ্ছে কিন্তু পাঠকবৃন্দ ধৈর্য হারাবেন না। আমি আপনাদের নিকটে মাওলানা মওদূদীর পরিচয় একজন সূফী হিসাবে করিয়ে দিচ্ছি। মাওলানার এ মর্যাদা সম্পর্কে নোমানী সাহেব ও তাঁর চিন্তাধারার লোকজন একমত হন অথবা দ্বিমত পোষণ করুন কিন্তু আমি বলতে চাই যে নোমানী সাহেব যে গুণাবলীকে তাসাওউফের জন্যে অনিবার্য বলে গণ্য করেন, আলহামদু লিল্লাহ মাওলানা মওদূদী সে সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং বহু বছর পূর্বেই এ সব তাঁর মধ্যে ছিল। আপনারা দেখতে পারেন যে-মাওলানার মধ্যে ইসলামের

উন্মাদনা পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং তাঁর তাওয়াককলের এ অবস্থা যে "পূর্ণ ও সার্বিক বিদ্রোহের ঘোষণা করা সত্ত্বেও একাকী সব কিছু করার সংকল্প দেখা যাচ্ছে। যখনই মানবসূলভ দুর্বলতা মন ভেঙে দিতে থাকে তখনই নবূয়্যতের ফয়েযপ্রাপ্ত বেলায়েত সংগে সংগেই لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -এর আওয়াজ শুনতে পায়। আল্লাহ তায়ালা ঠিকই বলেছেন ঃ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ،

এখন জামায়াতে ইসলামী কায়েম হচ্ছে। জামায়াত গঠনের প্রাথমিক খসড়া মাওলানার তৈরী করা ছিল এবং তর্জুমানুল কুরআনের মহররম-৬০ হিঃ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। ঈমানের সাক্ষ্য দানের পর তাৎক্ষণিক পরিবর্তন (যা না হলে বুঝতে হবে যে সে ব্যক্তি কালেমায়ে তাইয়েবা আদায় করার ব্যাপারে সত্য ছিল না)– মাওলানা নিম্নরূপ হওয়া উচিত বলে প্রস্তাব করেন ঃ

ক. ফরযগুলো শরীয়তের আনুগত্যসহ আদায় করতে হবে।

খ. কবিরা গোনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয়ে গেলে তওবা করতে হবে।

ফরযসমূহ পালন, কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং তা কোন সময়ে হয়ে গেলে তওবা করা এসব কি তাসাওউফ থেকে পৃথক কোন্ জিনিস? উপরন্তু ক্রমাগত পরিবর্তন (যা যদিও সকলের মধ্যে পাওয়া ত জরুরী নয় কিন্তু এ ব্যাপারে প্রত্যেকের আপন পূর্ণতার চেষ্টা করা জরুরী ছিল কারণ এসব পরিবর্তনের ফলে নাকেস্ অথবা কামেল হওয়ার উপর মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ নির্ভরশীল) মোটামোটি এরূপ ছিল ঃ

"সকল ব্যাপারে নিজের দৃষ্টিকোণ, চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি হেদায়েতে ইলাহী অনুযায়ী ঢেলে সাজানো, জীবনের উদ্দেশ্য, আপন পছন্দ ও মূল্যের মানদন্ড এবং আপন বিশ্বস্ততার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করে আল্লাহর সন্তোষ অনুযায়ী করা; এবং নিজের ঔদ্ধত্য ও প্রবৃত্তি পূজার প্রতিমা চূর্ণ করে রবের হুকুমের অধীন করে দেয়া।" সকল গোড়ামি থেকে নিজের মনকে সে সব ঝগড়াঝাটি ও তর্কবিতর্ক থেকে নিজের জীবনকে পাক পবিত্র করা যার ভিত্ প্রবৃত্তি পূজা ও দুনিয়া পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার কোন গুরুত্ব দ্বীনের মধ্যে নেই।"

"ফাসেক কাজের ও খোদা থেকে গাফেল লোকদের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নেক লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।"

নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে তৈরী করা, প্রবৃত্তি পূজার প্রতিমা

চূর্ণ করা, নফ্‌সানিয়াতের স্থলে লিল্লাহিয়াত, দুনিয়া পুরস্তির স্থলে খোদাপুরস্তি অবলম্বন করার এবং নেক লোকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা-রাহে সলুকের স্তর সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় কি? যদি সলুক ও তাসাওউফ শিল্পের ভাষা-পরিভাষায় কথা বলা হয়ে না থাকে তাহলে তার অর্থ কি এই যে সলুক ও তাসাওউফ স্বীকারই করা হয়নি? যদি এখানে "নেক লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা" না বলে যদি বলা হতো আহলে তাসাওউফ-এর কাছে বয়আত করার জন্যে এবং তাঁর সুহবত থেকে ফয়েজ হাসিল করার জন্যে তাঁর খেদমতে হাজিরী দেয়া"-তাহলেই কি বলা যেতো যে আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের তাসাওউফ গ্রহণ করা হ'য়েছে?

খসড়াতে জামায়াতে ইসলামীর প্রোগ্রামে এ বলা হয়েছে যে, এতে যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজের মন ও জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন অর্থাৎ তায্‌কিয়া করবেন। এ তায্‌কিয়া আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের তাসাওউফ থেকে পৃথক কেন গণ্য করা হলো যখন এ এক সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে তাসাওউফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স?

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে কায়েম হয়। সে সময়ে হিন্দুস্তানের দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে শুধু পঁচাত্তর ব্যক্তি একত্রে সমবেত হন। নিছক 'তায়াল্লুক বিল্লাহ' ও 'তাওয়াককুল আলাল্লাহ্' যদি না থাকতো, তাহলে এমন কোন্ উপায় উপকরণ ছিল যার ভিত্তিতে এতো বিরাট কাজ এমন মহান সংকল্পসহ শুরু করার শপথ করা হলো? এ কাজের প্রথম আহবায়ক ত মাওলানা মওদূদীই ছিলেন এবং তাঁরই ক্রমাগত দাওয়াত ও তবলিগের ফলেই ৭৫ জন খাঁটি ইসলামী ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি জামায়াত গঠন করার জন্যে এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা খতম করে দলবদ্ধভাবে সংগ্রামের সূচনা করার জন্যে একত্র হয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সে সময়ে তিনি এ কথা বলে আলাদা হয়ে গেলেনঃ

"আপনাদের জন্যে একটি জামায়াত গঠন করে দেয়ার পর আমার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আমি শুধু একজন আহবায়ক ছিলাম। ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলাম এবং আমার সকল চেষ্টা চরিত্রের উদ্দেশ্য এ ছিল যে এমন একটি জামায়াত গঠিত হোক। জামায়াত গঠনের পর এখন আমি আপনাদের মধ্যকারই একজন। এখন এ জামায়াতের কাজ এই যে তার মধ্য থেকেই একজন যোগ্যব্যক্তিকে তার আমীর নির্বাচিত করবে। তারপর এটা সেই আমীরের কাজ হবে ভবিষ্যতে এ আন্দোলন চালাবার জন্যে নিজের বুদ্ধি বিবেক অনুযায়ী একটি কর্মসূচী তৈরী করার এবং তা কার্যকর করার। আমার সম্পর্কে কারো যেন এ ভুল ধারণা না হয় যে, যখন দাওয়াত আমি দিয়েছি,

তখন ভবিষ্যতে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়াকেও আমি আমার হক মনে করি। কখনই না। না আমি এর অভিলাষী, আর না আমি এ দৃষ্টিভংগী স্বীকার করি যে আহবায়কেই শেষ পর্যন্ত নেতা হতে হবে।"

মাওলানা আরও বলেন ঃ

"প্রকৃত পক্ষে আমার আকাংখার উদ্দেশ্য ছিল এই যে একটি সঠিক ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থা কায়েম হোক এবং আমি তাতে শামিল হয়ে যাই। ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থার অধীন একজন চাপরাসির কাজ করাও আমার নিকটে কোন গায়ের ইসলামী ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্র প্রধান অথবা প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করা থেকে বেশী গৌরবজনক। অতএব এ কথা সত্য বলে ধরে নিবেন না যে, যেভাবে জামায়াত গঠনের পূর্বে সকল কাজ আমি আমার নিজ দায়িত্বে করতাম, তেমনি জামায়াত গঠনের পরেও আপনা আপনি জামায়াত পরিচালনার দায়িত্বও নিজ হাতে গ্রহণ করব অথবা গ্রহণ করতে চাইব। জামায়াত গঠনের পর আমার এখন পর্যন্ত যে ব্যক্তিগত মর্যাদা ছিল তা শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতের কাজের দায়িত্ব জামায়াতের প্রতি হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জামায়াত নিজের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব যার উপরেই অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করবে, তার আনুগত্য করা, তার শুভাকাংখী হওয়া, তার সহযোগিতা করা প্রত্যেক জামায়াত সদস্যের ন্যায় আমারও ফরয।"

জামায়াতের কার্যবিবরণী পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা আমার আলোচ্য বিষয় থেকে একেবারে পৃথক। আমি শুধু এ প্রশ্নের জবাব চাচ্ছি যে, গায়ের ইসলামী ব্যবস্থার অধীন রাষ্ট্র প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে ইসলামী জামায়াত ব্যবস্থার অধীন একজন চাপরাসির খেদমত আঞ্জাম দেয়াকে যিনি গৌরবজনক মনে করেন, এবং জামায়াত গঠনের পূর্বের আহবায়ক এবং জামায়াত গঠনের পরের নেতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তি "সূফী'ও হতে পারেন কিনা? যেহেতু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং আখেরাতের বাসনা তাসাওউফের গুণাবলীর অংশ বলা হয়ে থাকে, অতএব যার মধ্যে এসব পাওয়া যায়, তাকে সূফী কেন বলা যাবে না? মাওলানা মওদূদীর এ ভাষণের পর ইমারত সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলোচনা হয় কিন্তু সকলে একমত হওয়া সম্ভব-হয় না।

অবশেষে সাত জনের এক কমিটির উপর এ বিষয়টি ফয়সালা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কমিটিতে আমাদের অভিযোগকারী বুযর্গ মাওলানা নোমানী সাহেবও শামিল ছিলেন। এ কমিটি যা সিদ্ধান্ত করে সকলে তা মেনে নেবে। বহু চিন্তা-ভাবনা করার পর কমিটি একটি প্রস্তাব তৈরী করে এবং তা যখন গোটা জামায়াতের সামনে পড়ে শুনানো হয় তখন জামায়াত তা সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মওদূদী আমীর নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর মাওলানা যে ভাষণ দেন, যদি তা আপনারা পড়ে দেখেন, তাহলে আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন যে সে সময় পর্যন্ত মাওলানা 'রাহে সলুকের' কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করেছেন। যেমন "ইশ্‌ক্ ও জনুন" (প্রেম ও প্রেমোম্মাদনা) প্রকাশ লাভ করছে তার কথা থেকে ঃ

"আমার জন্যে ত এ আন্দোলন জীবনের উদ্দেশ্য। আমার জীবন-মরণ তারই জন্যে। কেউ সম্মুখে অগ্রসর না হলে আমি হবো। কেউ সহযোগিতা না করলে আমি একাকীই এ পথে চলবো। গোটা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধীতা করলে আমি একা তার বিরুদ্ধে লড়তে ভয় করব না।"

এ সম্মেলনে মাওলানা তার সংগী সাথীগণকে যে হেদায়াত দান করেন তার মধ্যে নিম্নের দুটি বিষয়ের হেদায়েত প্রনিধানযোগ্য ঃ

১. জামায়াতের রুকনদের কুরআন ও সীরাতুন্নবী (স) এবং সীরাতে সাহাবার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকা উচিত। এসব বার বার এবং অত্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। শুধু শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পিপাসা মিটাবার জন্যে নয় বরঞ্চ হেদায়েত ও পথ নির্দেশনা লাভের জন্যে পড়তে হবে। কোথাও যদি এমন কোন লোক পাওয়া যায় যিনি দরসে কুরআন দেয়ার যোগ্যতা রাখেন, সেখানে দরসে কুরআন শুরু করতে হবে।

২. এ আন্দোলনের প্রাণ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে তায়াল্লুক বিল্লাহ (আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কে স্থাপন)। যদি আল্লাহ্‌র সাথে আপনাদের সম্পর্ক দূর্বল হয়, তাহলে আপনারা হুকুমতে এলাহীয়া কায়েম করতে এবং তা সাফল্যের সাথে চালাবার যোগ্য হতে পারবেন না। অতএব ফরয নামায ছাড়াও নফল ইবাদতেরও নিয়মিত ব্যবস্থা করুন। নফল নামায, নফল রোযা এবং সদকা এমন সব জিনিস যা মানুষের মধ্যে এখলাস ও ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করে। আর এ সব যতদূর সম্ভব গোপনে করা উচিত যাতে 'রিয়া' না হয়। নামায

বুঝে পড়বেন। এমনভাবে নয় যে কোন মুখস্থ জিনিস মুখ দিয়ে পুনরাবৃত্তি করছেন। বরঞ্চ এমনভাবে যে আপনি স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাছে কিছু আরজ করছেন। নামায পড়ার সময় নিজের নফ্‌সের পর্যালোচনা করুন যে, যে সব কথার ঘোষণা আপনার আলিমুল গায়েবের কাছে করছেন আপনাদের আমল তার বিপরীত নয়ত? এবং আপনাদের ঘোষণা মিথ্যা নয়ত? এ মুহাসাবায়ে নফ্‌সে আপনাদের যে সব দোষত্রুটি অনুভব করবেন তার জন্যে ইস্তেগফার করুন এবং ভবিষ্যতে সে সব দোষত্রুটি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করুন। ইবাদতে এ বিষয়ের খেয়াল রাখবেন যে, যতটুকু আমল আপনারা সর্বদা ঠিকমত করতে পারবেন, ব্যস ততটুকু নিয়মিত অভ্যাস করুন। যে সব আমল ও মুজাহাদা, রিয়াযত, মাশাগেল, জপতপ সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয় তা থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখতে হবে হাদীসের শুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দেসীনকেই সনদ মানতে হবে। গায়ের মুহাদ্দেসীন যতো বড়ো বুযর্গই হোকনা কেন তারা সনদ হতে পারেন না। বেশী ভয়ংকর বিদআত ওসব খারাপ জিনিস নয় যাকে সকলে খারাপ বলে জানে, বরঞ্চ বিদআত ওসব দৃশ্যতাঃ ভালো জিনিস যা ভালো মনে করে শরিয়তে অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে।"

এ কুরআন, সীরাতুন্নবী এবং সীরাতে সাহাবার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এ 'তায়াল্লুক বিল্লাহকে' আন্দোলনের প্রাণ গণ্য করা, ফরয ইবাদত ছাড়াও নফল ইবাদতের নিয়মিত অভ্যাস, এ ইখলাস, 'রিয়া' থেকে বিরত থাকা নামায বুঝে পড়া, মহাসাবায়ে নফ্‌স এবং ইস্তেগ্‌ফার এ সব কি তাসাওউফের গন্ডির বাইরে? যদি তাসাওউফ প্রকৃত পক্ষে সে বস্তুই হয় যাকে ইখলাস, ইহসান, তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তাহলে এ সব তার গন্ডির বাইরে থাকার অর্থ কি? এই ত অবিকল তাসাওউফ। এখন রইলো একথা যে, সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয় এমন সব অনুশীলন, তপজপ প্রভৃতি থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। এত একজন শরিয়তের হুকুম পালনকারী ও সুন্নাতের অনুসারী সূফীরই পরিচয় বহনকারীর আলামত হওয়া উচিত। এতে অভিযোগ করার কোন অবকাশ আছে কি?

জামায়াত সম্পর্কে মাওলানা নোমানীর সুস্পষ্ট অভিমত

যদিও একথা অধিকাংশ লোকের জানা আছে যে, মাওলানা নোমানী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর 'সাবেকুনাল আওয়ালুনের' (আন্দোলনে সর্ব প্রথম সাড়াদানকারী ও অগ্রগামী দল) এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের একজন। কিন্তু আমি তাঁর অভিযোগের ধরন দেখার পর এ কথার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ এ সব অভিযোগ দেখার সাথে সাথে কেউ যদি ঐসব ধারণা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন যা জামায়াতের প্রাথমিক যুগে মাওলানা নোমানী প্রকাশ করেন তাহলে সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে মাওলানা মওদূদীর চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বিন্দু মাত্র পরিমাণেও পরিবর্তন হয় নি। অবশ্য মাওলানা নোমানীর চিন্তাধারা বদলে গেছে। তা পরিবর্তন জামায়াত থেকে পৃথক হওয়ার পরে হোক অথবা পরিবর্তনই পৃথক হওয়ার কারণ হোক। মোট কথা এ অবস্থায় তাঁর অভিযোগ স্বয়ং অভিযোগ করার যোগ্য। তিনি শুধু এ সম্মেলনেই শরীক হন নি যেখানে জামায়াত গঠন করা হয়, বরঞ্চ তার পূর্বে সে সম্মেলনেও মাওলানা মওদূদীর আহ্বানে শরীক হন যেখানে 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তারপর যখন জামায়াতে ইসলামী গঠিত হলো তখন মাওলানা মওদূদীর পর তাজদীদে ঈমান করে জামায়াতে শরীক হওয়ার ঘোষণা ইনিই করেছিলেন। তারপর তিনি জামায়াতের উদ্দেশ্য, তার গঠনতন্ত্র, তার জামায়াতী ব্যবস্থা ও তার কর্মপদ্ধতির উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকেন। এ সম্পর্কে উদ্ভূত সন্দেহ সংশয় দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এমন কি মওদূদীর পক্ষ থেকেও প্রতিরোধের হক আদায় করেন। আমি তার সে সময়ের চিন্তা-ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে পাঠকবর্গকে পরামর্শ দিতে চাই যে, তারা যেন অন্ততঃ পক্ষে তার দুটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ অবশ্যই পড়েন। "দ্বীনী আন্দোলনের পরিচিতি" এবং "জামায়াতে ইসলামীর হাকীকত এবং আমাদের কাজের ধরন" শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি ধারাবাহিকভাবে তর্জুমানুল কুরআন-খন্ড ১৯ এবং খন্ড-২১ এ প্রকাশিত হয়। এ সব প্রবন্ধে তিনি বার বার স্বীকার করেন যে, "আমি নিজেকে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যে জরুরী মনে করেছিলাম তা করেছিলাম দূরদর্শিতার সাথে এবং স্বয়ং আমি এ জামায়াত গঠনের পূর্বে এ ধরনের একটি জামায়াতের প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি আরও বলেন যে প্রথম সম্মেলনে কিছু পর্যবেক্ষণ তাঁর মানসিক

শান্তি এনে দেয়। তা একটি তাঁরই ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্যে বিভিন্ন স্থান থেকে যাঁরা এসেছিলেন শুধু তাঁদের কথা বার্তায় নয় বরঞ্চ সাধারণ কর্মপদ্ধতিতে ইখলাস লিল্লাহ ও দ্বীনদারীর প্রবণতা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করেছিলাম।"

আরও বলেন,

"সব চেয়ে বেশী যে জিনিস আমাকে প্রভাবিত করে তা ছিল এ সম্মেলনের এ মূলনীতি যে প্রত্যেক ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি আমাদের বিচারক।"

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে তিনি (নোমানী সাহেব) বলেন ঃ

"এ সবের মধ্যে এমন কিছু অভিযোগ রয়েছে, যা নিছক বানোয়াট ও বোহতানের পর্যায়ভুক্ত। এ সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাদেরকে বানোয়াট ও মিথ্যা আরোপ করা থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দিন এবং মুসলমানদেরকে এতোটুকু বুদ্ধিমত্তা দান করুন যাতে অনুসন্ধান ব্যতীত কারো সম্পর্কে এ ধরনের খারাপ ধারণা মনে স্থান দেয়ার জন্যে তৈরী না হন।"

তিনি আরও বলেন ঃ

"মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে একটি শেষ এবং সার্বিক কথা এ বলতে চাই যে, আমাদের নিকটে তিনি ইলমে দ্বীনে অতি দূরদর্শিতাসম্পন্ন একজন মুমেন। আমরা তাঁকে ফরযসমূহ পালনকারী এবং গোনাহ্ থেকে দূরে থাকার কার্যত ঃ আমলকারী পেয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য সামনে রেখে তার আমীরের যে সব গুণাবলী থাকা দরকার তা তাঁর মধ্যে আছে বলে আমরা মনে করি। জামায়াত প্রতিষ্ঠার সময় লাহোরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে যোগ্য পেয়েছি এবং আমরা তাঁকে নির্বাচিত করেছি।"

যদি পাঠকবৃন্দ মাওলানা নোমানী সাহেবের এ সব মন্তব্য এবং তাঁর পরবর্তীকালের সমালোচনা ও অভিযোগগুলো পাশাপাশি রেখে দেখেন, তাহলে তাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে, জামায়াতের প্রাথমিক যুগে নোমানী সাহেব কোন্ তাসাওউফের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরে কোন্ তাসাওউফ অবলম্বন করেন। এ কথা পরিষ্কার যে, এ দু ধরনের তাসাওউফ দুটি পৃথক

ধরনের। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যদি তাঁর নিকটে আহলে সুন্নাতের গৃহীত তাসাওউফ সেটাই হয়ে থাকে যার ধারক ও বাহক তিনি জামায়াতের প্রাথমিক যুগে ছিলেন, তাহলে তাঁর পরবর্তী চিন্তা ও ধারণা কি আপনা আপনি বাতিল প্রমাণিত হয় না? আর তাঁর নিকটে যদি এ তাসাওউফ ঐ ধরনের তাসাওউফ হয়ে থাকে যা তিনি পরে অবলম্বন করেন, তাহলে জামায়াতে অংশ গ্রহণ করার সময় তিনি সে সম্পর্কে অভিযোগ করেন নি কেন? সে সময়ে তিনি জামায়াতের লোকদের মধ্যে 'ইখলাস্ লিল্লাহ্‌র' যে সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখতে পান, তা কোন্ পথে সৃষ্টি হয়েছিল? তারপর যখন স্বীয় আমীরসহ জামায়াতের অন্যান্য সকলে আহলে হক ও সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলকে সালিশ মানার নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতি নোমানী সাহেব সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত কেন হলেন? তারপর এসব লোকের সাথেই নয় বরঞ্চ আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথেও কত নির্মম উপহাস যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে সামষ্টিকভাবে এ মতৈক্যে উপনীত হওয়া গেল যে, তিনি ইলমে দ্বীনে দূরদর্শী ফরযসমূহ আদায়কারী এবং গোনাহ থেকে কার্যতঃ দূরে অবস্থানকারী এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর অধিকারীদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি, তাকেই এখন দ্বীনের একটি বিভাগ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ বলে গণ্য করা হয় এবং অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, এ বিভাগ সম্পর্কে তাঁর কোন অনুরাগ কোন সময়েই ছিল না।

জামায়াত গঠনের সাথে সাথেই মাওলানাকে বিভিন্ন ধরনের বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তাতে চিন্তার ক্ষেত্রে ও বাস্তব জীবনের নেতৃত্ব দেয়ার সাথে তাঁর আযীমত ও অবিচলতা যদিও তাসাওউফের পথে নিবিষ্ট থাকারই ফল, তথাপি তা সরাসরি জামায়াতের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে বিধায় আমার মূল বক্তব্যের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তার আলোচনা বন্ধ রাখছি। অবশ্য জামায়াত গঠনের প্রায় দু'বছর পর জামায়াতের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে তর্জুমানুল কুরআন রবি আউয়াল ও সানী-৬২ হিঃ সংখ্যায় প্রকাশিত মাওলানার মন্তব্য নিম্নে দেয়া হলো।

"সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা আমাদের নিকটে অন্য যে কোন বিষয় থেকে অধিক মূল্যবান তা এই যে, এ দাওয়াতের প্রভাব যেখানেই পৌছেছে সেখানেই তা মৃত বিবেককে জাগ্রত করেছে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া এ হয় যে নফ্‌স তার নিজের মহাসাবা শুরু করেছে। হালাল ও হারাম, পাক ও নাপাক, হক ও

নাহক-এর বাছবিচার অতীতের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার তুলনায় এখন অনেক ব্যাপকভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে। পূর্বে দ্বীনদারী সত্ত্বেও যা করা হতো, তা এখন আর মেনে নেয়া হয় না। বরঞ্চ তা স্মরণ করতে লজ্জা হয়। পূর্বে যাদের জন্যে কোন ব্যাপারের এ দিকটা সবচেয়ে কম বিবেচ্য ছিল যে এ খোদার দৃষ্টিতে কেমন, তাদের জন্যে এখন এ প্রশ্নটিই অগ্রাধিকার লাভ করেছে। পূর্বে দ্বীনী অনুভূতি এতো ভোঁতা হয়ে পড়েছিল যে, বিরাট বিরাট বিষয় সম্পর্কে, কোন খট্‌কা লাগতো না। এখন তা এমন তীব্র হয়েছে যে, ছোটো খাটো বিষয়েও ঘট্‌কা লাগতে শুরু হয়েছে। খোদার সামনে দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহির অনুভূতি এখন জাগ্রত হচ্ছে। জীবনের বহুক্ষেত্রে এ অনুভূতির কারণে সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মানুষ এখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে শুরু করেছে যে, দুনিয়ার জীবনে যা কিছু চেষ্টা চরিত্র সে করছে তা কি খোদার দাঁড়িপাল্লায় কোন ওজন বহন করবে, না নিছক هَبَاءً مَنْثُوْرًا (ধূলিকণার মতো) হবে।" (পৃঃ ৪ ও ৫)।

এটাই সে জিনিস যাকে আমরা 'তাসাওউফ' বলি এবং মনে করি। যদি কেউ এর মধ্যে "তাসাওউফ'-এর কোন ঝলক দেখতে না পায় তাহলে তার কারণ হয়ত এই যে-সূফীয়ানা ইল্‌মে কালামের ভাষা তার কাছে এতোটা প্রিয় ও পরিচিত যে, এ ছাড়া অন্য কোন স্থানে 'তাসাওউফ' আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। অথবা এও হতে পারে যে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তার কাছে অন্য কিছু।

অতঃপর অনতিবিলম্বে স্বয়ং তর্জুমানুল কুরআনের সম্পাদকীয়তে মাওলানা ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা, তার ব্যক্তিত্বের নৈতিক উন্নতি ও বিকাশ, তায্‌কিয়া নফ্‌সের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্থায়ী ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার সূচনা করেন যা ১৯৪৩ সালের মে মাস থেকে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় এ ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। নতুবা প্রত্যেক পাঠক তা পড়ার পর তার প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্যের সঠিক ধারণা করতে পারতেন। যাদের নিকটে উপরোক্ত সংখ্যাগুলো আছে, তাঁদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তাঁরা যদি তা কখনো পড়ে থাকেন, তথাপি দ্বিতীয় বার যেনো তাঁরা পড়েন এবং বারবার পড়েন। আমি জামায়াতের সমর্থক সহযোগিদের প্রতিও তাকীদ করব যে তারা যেনো কখনো এর থেকে

নিজেদেরকে বঞ্চিত না রাখেন। বিরোধী ও অভিযোগকারীদের প্রতিও অনুরোধ, যদি ইনসাফ বলে কোন বস্তু তাদের মধ্যে থাকে তাহলে তাঁরা যেনো মুখ ও কলম ব্যবহারের পূর্বে এ প্রবন্ধগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তারপর যেন ইনসাফ ও ঈমানদারীর সাথে এ সম্পর্কে সুবিবেচনামূলক মতামত ব্যক্ত করেন।

এ সময়ে মাওলানা অসুখে ভুগছিলেন। অতএব বহু চেষ্টা করেও যখন তিনি প্রবন্ধ লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, তখন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী এ বিষয়ে লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধাদি 'হাকীকতে তাক্ওয়া' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এখন প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী মুসলমানের এতোটুকু কষ্ট স্বীকার করতে হবে যে, যদি তাঁরা এ সব পড়ে না থাকেন, তাহলে একটু সময় বের করে পড়ে নেবেন। তাহলে ধারণা করতে পারবেন যে এ বুযর্গ কোন্ তাসাওউফের বিরোধী এবং কোন্টার সমর্থক।

ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি চেহারা ও পোষাকের ইসলামী ধরন ধারণ কেমন হবে বলে এক প্রশ্ন করেন। মাওলানার জবাব আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। পাঠকবর্গ যদি মনোযোগ সহকারে পড়েন তাহলে তারা জানতে পারবেন যে, ইসলামের প্রকৃত তাসাওউফ কি এবং এটাও জানতে পারবেন যে এ তাসাওউফের উৎস কি। মাওলানা বলেন ঃ

"লেবাস ও চেহারার ধরন ধারণ সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাবও আমি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার পুর্বে একথা ভালোভাবে বুঝে নেবেন যে, আভ্যন্তরীণ সংস্কার সংশোধনের উপর বাহ্যিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত হবে না। সর্ব প্রথম নিজেকে কুরআনের মান অনুযায়ী সত্যিকার মুসলমান বানাবার চেষ্টা করুন। তারপর বাইরের পরিবর্তন ততোদূর পর্যন্ত করতে থাকুন, যতোদূর ভেতরে প্রকৃত পরিবর্তন হতে থাকবে। নতুবা নিছক রীতি পদ্ধতি ও আইনকে সামনে রেখে যদি আপনি আপনার বাইরকে ঐ নক্শার উপর ঢেলে সাজান যা ফেকাহ ও হাদীস গ্রন্থে একজন মুত্তাকীর বাহ্যিক চিত্র হিসাবে পেশ করা হয়েছে, অথচ ভেতরে প্রকৃত তাকওয়া পয়দা হয় নি, তাহলে আপনার দৃষ্টান্ত এমন হবে যেমন তামার মুদ্রার উপর সোনার ছাপ মারা হয়েছে। সোনার ছাপ লাগানো কোন কঠিক কাজ নয়। অতি সহজে অতি সস্তা ধাতুর উপর সে ছাপ লাগাতে পারেন কিন্তু খাঁটি সোনা চিনতে পারা বড়ো কঠিন। বহু দিনের

রাসায়নিক পরীক্ষার পর এ বিদ্যা অর্জন করা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের এখানে এককাল থেকে বাইরের উপর অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তার ফল এই যে, সোনার ছাপের সাথে তামা, লোহা, শিশা এবং হরেক রকমের নিকৃষ্ট ধাতুর ছাপও প্রচলিত হয়েছে। বাস্তব দুনিয়ার বাজার এমন নিরপেক্ষ স্বর্ণকারের মত যে সে বেশী দিন জালমুদ্রার দ্বারা প্রতারিত হবে না। কিছু দিন ত আমাদের জাল স্বর্ণ মুদ্রা ত চল্লো, কিন্তু এখন বাজারে তার এক কড়াক্রান্তি মূল্য নেই। অতএব আমাদের যে ধরনের দ্বীনদারী পয়দা করা দরকার, তার দাবী এই যে, স্বর্ণ মুদ্রার ছাপ লাগাবার পূর্বেই যেনো আমরা খাঁটি স্বর্ণ মুদ্রা হওয়ার চেষ্টা করি।

লেবাস ও চেহারার ধরন ও কাটছাট এবং এ ধরনের অন্যান্য দৃশ্যমান বিষয়াদি সম্পর্কে নবী (স) যতো হেদায়েত দিয়েছেন তা মদীনার শেষ ছয় বছরের মধ্যে দিয়েছেন। এর পূর্বে পনোরো ষোল বছর যাবত তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তাক্ওয়া এবং ইহসানের সে সব গুণাবলী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন যার বিশদ চিত্র কুরআন মজিদ এবং নবী (স) এর হাদীসসমূহে বয়ান করা হয়েছে। এ ক্রমবিন্যাসের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে জানা যায় যে, খোদা যাকে তায্কিয়ায়ে নফসের খেদমতের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তিনিও প্রথমে তার পূর্ণ মনোযোগ দান করেন অশোধিত ধাতুকে স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করতে। যখন তা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করা হলো তখন তার উপর স্বর্ণ মোহরের ছাপ অংকিত করা হয়। তবে এ আগে পেছনে করার অর্থ এ নয় যে তাকে শরিয়তের হুকুম পালন থেকে সরে পড়ার বাহানা বানানো হয়। বরঞ্চ তার অর্থ এই যে, এ ধরনের মুত্তাকীপনার ঢং বানানো থেকে বিরত থাকা যার মধ্যে প্রকৃত তাকওয়া ও খোদাভীতি পাওয়া না যায় এবং যার মধ্যে ইসলামী চরিত্রের প্রাণশক্তি নেই।" (তর্জুমানুল কুরআন, খন্ড-২৩, সংখ্যা ৩/৪, পৃষ্ঠা ৪০৭-৪০৮)।

ইতিমধ্যে দারভাংগা ও কেন্দ্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়। দারভাংগা সম্মেলনে মাওলানা বলেন ঃ

"আমাদের নিকটে বাইর থেকে ভেতরের গুরুত্ব অধিক। এ কারণে শুধু সংগঠন ও ছোটখাটো যথারীতি কর্মসূচীর মাধ্যমে লোকদের পরিচালনা করা ও জন সাধারণকে কোন পথে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের কাজ চলতে পারে না। জন সাধারণের মধ্যে গণআন্দোলন চালাবার পূর্বে এমন লোক তৈরীর চিন্তা করতে হবে যারা উৎকৃষ্ট ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হবে এবং উন্নতমানের মানসিক

যোগ্যতাও রাখবে যে চিন্তার পূনর্গঠনের সাথে সামাজিক নেতৃত্বদানের দায়িত্বও পালন করবে।"

কেন্দ্রীয় সম্মেলনে মাওলানা বলেন ঃ

"ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী গুণ এই যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাথে লড়াই করে তাকে প্রথমে মুসলমান ও খোদার অনুগত বানাবে। এত সেই কথা যা হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে-

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ –

(প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্যে তার নফ্‌সের সাথে লড়াই করে।)

বহির্জগতে খোদাদ্রোহীদের মুকাবিলা করার পুর্বে ঐ খোদাদ্রোহীকে অনুগত করুন যে আপনার ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে এবং খোদার আইন ও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলার জন্য আপনাকে সর্বদা তাকীদ করে। এ বিদ্রোহী যদি আপনার ভেতরে লালিত পালিত হয় এবং আপনার উপর এতোটা ক্ষমতা রাখে যে খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলার দাবী আপনার দ্বারা মানিয়ে নিতে পারে তাহলে এ এক অর্থহীন ব্যাপার হবে যে বাইরে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এত ঠিক এ রকম যে ঘরে মদের বোতল পড়ে রয়েছে আর বাইরে মদখোরদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। এ বৈপরিত্য আমাদের আন্দোলনের জন্য ধ্বংসকর। প্রথমে নিজে খোদার সামনে মস্তক অবনত করুন তারপর অন্যের কাছে খোদার আনুগত্যের দাবী করুন।"

এটাকে আপনারা কোন্ নামে অভিহিত করবেন? এ বাতেনের গুরুত্ব, জনগণের মধ্যে কাজ করার পূর্বে ইসলামী চরিত্র গঠন এবং এ নফ্‌সের জিহাদ 'তাসাওউফ' যদি না হয়, তাহলে এ শব্দটি অর্থহীন ছাড়া আর কি হতে পারে?

এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে জামায়াতে ইসলামীর নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে এক হাজার লোক যোগদান করেন। এতে যদিও বিভিন্ন সময়ে তাসাওউফের কোন না কোন ভাবে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু এ বিষয়ের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মাওলানা তার ভাষণে করেন-

"আমি অসুস্থতা ও দূর্বলতা সত্ত্বেও এ দীর্ঘ ভাষণ এ জন্যে দিলাম যে সত্য কথা বিশদভাবে আপনাদের সামনে পৌছিয়ে দিয়ে খোদার দরবারে দায়মুক্ত হতে চাই। জীবনের কোন বিশ্বাস নেই। কেউ জানে না কখন বয়সের অবকাশ

পূর্ণ হবে। এ জন্যে আমি জরুরী মনে করি যে সত্য পৌঁছাবার যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত তার থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাই। কোন কিছুর ব্যাখ্যা প্রয়োজনবোধ করলে জিজ্ঞেস করুন। যদি কোন কথা আমি সত্যের বিপরীত বলে থাকি ত তার খন্ডন করুন। আর যদি আমি সঠিকভাবে সত্য আপনাদের কাছে পৌঁছেয়ে দিয়ে থাকি তাহলে তার সাক্ষ্য দিন" (শ্লোগান-আমরা সাক্ষী, আমরা সাক্ষী)।

সৌভাগ্যের বিষয় ভাষণটি জামায়াতের 'কার্যবিবরণী-৩য় খন্ডে' দেখা যেতে পারে এবং পুস্তকাকারেও তা প্রকাশিত যার শিরোণাম "তাহ্‌রিকে ইসলামী কি আখলাকী বুনিয়াদেঁ" (ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি)।

আমি জানতে চাই এ সব কিছু দেখা এবং পড়ার পর কে এমন আছে যে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করতে পারে যে, তিনি আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের গৃহীত তাসাওউফ থেকে মুক্ত?

এ যাবত মাওলানা মওদূদীকে বহু অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু জান ও মালের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অগ্নিপরীক্ষা সে সময়ে শুরু হয় যখন মাওলানার সাবেক কেন্দ্র-দারুল ইসলাম পাঠানকোট সাম্প্রদায়িক দাংগার লেলিহান শিখার দ্বারা আবেষ্টিত হয়ে পড়ে। সকলেই জানেন যে এ দাংগা শুরু হয় ১৯৪৬ সালের আগষ্ট থেকে। সাম্প্রদায়িক দাংগার অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে বনের আগুনের মতো গোটা দেশের শান্তি শৃংখলা ভস্মিভূত করে। ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ এ আগুন যখন পাঠানকোটে পৌঁছে তখন দারুল ইসলামে কয়েক হাজার আশ্রয়প্রার্থী পৌঁছে গেছেন। তাদের দেখা-শুনা, খাওয়া-দাওয়া ও প্রতিরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জামায়াত বহন করে। ২৩শে আগষ্ট সন্ধ্যায় চার দিক থেকে এ ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো "হামলাকারী দল এসে গেল" কিন্তু দারুল ইসলাম বস্তিতে কোন সাড়া শব্দ ছিল না। অবশ্য সকলে আপন আপন স্থানে সতর্ক-সচেতন ও জীবনের শেষ সংগ্রামের জন্য তৈরী ছিলো। কোন আক্রমণকারী আসে নি। কিন্তু পরদিন দারুল ইসলামের চৌকিদার আবদুর রহমান বাহওয়ালপুরীকে হত্যা করা হয়। তিনি আশ্রয়প্রার্থী মহিলাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য নিকটস্থ বস্তিতে গিয়েছেলেন। যখন এ সংবাদ পাওয়া গেল যে তার লাশ দারুল ইসলামের গন্ডির বাইরে পড়ে আছে. তৎক্ষণাৎ মাওলানা মওদূদী আটজনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেন এবং বলে দেন যে, এ বস্তিতে আনার পরিবর্তে ওদিকেই কবরস্তানে

যেনো তা দাফন করা হয়। নইলে আশ্রয়প্রার্থীগণ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কোন অঘটন ঘটাতে পারেন।

আবদুর রহমানের বুকে বল্লমের আঘাতে কয়েকটি ছিদ্র হয়েছিল এবং হাতে ও ঘাড়ে কৃপানের আঘাত ছিল, কিন্তু পিঠে কোন ক্ষত ছিল না। তিনি শহীদ ছিলেন। এজন্যে তাঁকে রক্তাক্ত জামা-কাপড়সহ দাফন করা হয়। এ ঘটনা থেকে এ কথা নিশ্চিত হয় যে আগামী রাতেই দারুল ইসলামে হামলা করা হবে। অতএব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হলো। সন্ধ্যার সময় মহিলা ও শিশুদেরকে মাওলানার বাসগৃহে একত্র করা হলো। এশার নামাযের পর মাওলানা মহিলাদের উদ্দেশ্যে ঈমান উদ্দীপক ও সাহসিকতাপূর্ণ ভাষণ দেন ঃ

"হয়তো এটা দারুল ইসলামের জীবনের শেষ দিন। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পুরুষদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকবে, দুশমন ইনশা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট পৌছতে পারবে না। কিন্তু খোদা না খাস্তা পুরুষ যদি খতম হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের মুমেন মহিলার মতো মারতে ও মরতে হবে। কিন্তু আত্মহত্যা করা ও নিজে জীবিত অবস্থায় দুশমনের কাছে আত্মসমর্পন করা চলবে না। হামলাকারীদের মুকাবিলা করো এবং নিজের ইজ্জতের জন্যে লড়ে জীবন দিও।"

তারপর আশ্রয়প্রার্থী মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয়া হয়। তাদের অনেকে ধারণাই করতে পারেনি যে সেখানে কোন্ পরিস্থিতির মুকাবেলা করার প্রস্তুতি করা হচ্ছিল। মাওলানা একজন সাথীসহ একনলা বন্দুক হাতে করে চেয়ারে বসে বসে রাত কাটিয়ে দেন। মুখে مَتَى نَصْرُ اللّٰه ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না। ভালোভাবে খোদার ফজলে রাত কেটে গেল। পরদিন লাহোর থেকে কতিপয় বন্ধু-বান্ধব দুটি বাস নিয়ে দারুল ইসলাম পৌছেন। তাঁরা বলেন, বহু কষ্টে দুটি বাস তাঁরা নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় বার সাহায্য পৌছাবার কোন সুযোগ নেই। তাঁরা আরও বলেন, "আপনারা মহিলা ও শিশুদের নিয়ে সত্বর বাসে চড়ে বসুন।"

মাওলানা মওদূদী বলেন, আমরা আড়াই হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। এ শুধু আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এবং তার প্রদত্ত শক্তিবলে। যতোক্ষণ পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থীদের হেফাজতের সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হয়েছে, আমরা এখান থেকে যাব না। আমরা তাদেরকে খোদা ও রসূলের নামে আশ্রয় দিয়েছে। আমাদের শপথ আমরা যে কোন মূল্যে পূরণ করব।"

অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে মহিলা ও শিশুদেরকে এ বাসে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং সকল পুরুষ অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে দারুল ইসলামে রয়ে যাবেন। এ কদিন জুমার নামায মওকুফ করা হয় এবং দারুল হরবের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে সকল নামায 'সালাতে খাওফ' হিসাবে আদায় করা হয়। ফল এ হয় যে مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ এর জবাব اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ আল্লাহর দরবার থেকে এ ভাবে পাওয়া যায় যে, একদিকে কোন আন্দোলন অথবা আবেদন ছাড়াই দারুল ইসলামকে সরকারী ক্যাম্প ঘোষণা করে সামরিক বাহিনী তার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এ ভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের হেফাজতের যে দায়িত্ব মাওলানা গ্রহণ করেছিলেন সে দায়িত্ব থেকে আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করেন এবং অপরদিকে লাহোর থেকে এক ভাই সেনাবাহিনীর একটি দল ও তিনটি বাসসহ এসে পৌছেন। তারপর মাওলানা আশ্রয়প্রার্থী ও সংগীসাথীদের নিয়ে ৩০শে আগষ্ট দারুল ইসলাম থেকে লাহোর রওয়ানা হন। মাওলানার যে সব আসবাবপত্র ও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদিসহ যে লাইব্রেরী রয়ে গেল, তার মূল্য আনুমানিক সত্তর হাজার টাকা।

এ যদিও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু এ ঘটনায় তাসাওউফের কোন ঝলক কি আপনার চোখে পড়ে না? তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, তার প্রেমোম্মাদনা (ইশ্ক ও জনুন) দুনিয়ার প্রতি অনীহা আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ ও মৃত্যু বা শাহাদতের তামান্না যদি তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে এখানে তাসাওউফ ছাড়া আর কি আপনি পেতে পারেন?

লাহোরে পৌছার পর ক্রমাগতভাবে মাওলানা যে সব অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে থাকেন, তাতে একথা আয়নার মতো পরিষ্কার হয় যে, যদি এ ব্যক্তি কামেল দরজার সূফী না হতেন তাহলে তার থেকে সে সব কিছু প্রকাশ পেতো না, যা প্রকাশ পেয়েছিল। বস্তুতঃ মাওলানা যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের অভিযান শুরু করেন তখন যে পরিস্থিতি ছিল তা সরাসরি ধারণা করতে হলে নঈম সিদ্দীকী সাহেবের নিম্নের কথাগুলো পড়ে দেখা উচিত।

"সে সময়ে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচারণা, উপরন্তু কিছু সংবাদ পত্রের বিরোধী ফ্রন্ট গঠন, কিছু মৌলভীর ফতোয়া ও জুমার খুৎবা জনমতকে এতোটা বিক্ষুদ্ধ করেছিল যে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ ছিল না। কিন্তু মাওলানা এ ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ পরিবেশেও সে মর্যাদাসহ আযিমতের পাথর হয়ে রইলেন। তিনি জামায়াতের এক এক ব্যক্তির মধ্যে সত্যের উপর অটল থাকার

প্রেরণা সৃষ্টি করেন। অবস্থা এ ছিল যে, মসজিদের মেম্বর থেকে মাওলানাকে হত্যা করার প্রকাশ্যে উসকানি দেয়া হতো। রাস্তা দিয়ে চলাফেরার সময় জামায়াত কর্মী এ আশংকা করতো যে কখন গুন্ডাদের পক্ষ থেকে তার উপর হামলা হয়। এ ধরনের এক একটি খবর নিয়ে আমরা বার বার কেন্দ্রে আসতাম। কিন্তু মাওলানার সাথে কথা বলার পরই সব আশংকা দূর হয়ে যেতো। সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের এক নতুন শ্রোত বয়ে যেতো। মাওলানা কর্মীদের হতবিহ্বলতার প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে তাদের উপর নিজের আযীমতের প্রভাব বিস্তার করতে সফলকাম হতেন। যখন কেউ আসতো তিনি দূর থেকে তার চেহারা দেখেই তার মনস্তাত্বিক অবস্থা আঁচ করে নিতেন এবং সালামের জবাব দেয়ার সাথে সাথে প্রফুল্ল চিত্তে জিজ্ঞেস করতেন, বলুন জনাব কি অবস্থা? কথা বলার পূর্বেই আগত ব্যক্তির আবেগ জড়িত অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেতো।

তিনি আরও বলেন ঃ

"এ সময় কালে বিভিন্ন লোক মাওলানকে গ্রেফতার করা হবে বলে সজাগ করে দিতেন। অপরদিকে এক অতি ভয়ানক ষড়যন্ত্রের গুজবও শোনা গেল। আমরা চাচ্ছিলাম যে মাওলানা কিছুটা সাবধানতার সাথে কাজ করবেন। কিন্তু তিনি হামেশা যা বলতেন তাই বল্লেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছ থেকে তার দ্বীনের খেদমত চান, আমি আমার জন্যে কোন আশঙ্কা অনুভব করি না। আর যখন তাঁর পক্ষ থেকে এ অবকাশ শেষ হয়ে যাবে, তখন কোন সতর্কতা হেফাজতের গ্যারান্টি হতে পারেনা।"

(মাওলানা মওদূদী অগ্নিপরীক্ষার কষ্টি পাথরে-চেরাগেরাহ, করাচী, মার্চ ১৯৫৪)

পাঠকবৃন্দ, খেয়াল করুন, মাওলানা সীরাতে নববীর (স) ছবি কত অংশ নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাক্ওয়া ও ইহসান থেকে নীচে নেমে এসে কোন স্থানে দন্ডায়মান ব্যক্তির মধ্যে এ সীরাত কখনো প্রকাশলাভ করতে পারে না। আমাদের এও দৃঢ় বিশ্বাস যে তাক্ওয়া ইহসান অথবা তাসাওউফের ভ্রান্ত ও অনিশ্চিত অর্থসহ যারা নিভৃত কক্ষে বসে রূহানী উন্নতির স্তর অতিক্রম করে চলেন, এ মর্যাদা তাদের ভাগ্যেও জুটবে না।

তারপর মাওলানাকে দুজন সাথীসহ ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার করা হয়। তখনকার অবস্থা নঈম সিদ্দিকী সাহেবের ভাষায় শোনার মত ঃ

"কিছুক্ষণ পর মাওলানা শেরওয়ানী পরিধান করে প্রফুল্লচিত্তে হাসিমুখে এমনভাবে বেরিয়ে এলেন যেমনটি তাঁকে দেখা যায় কোন সফরে বেরুবার সময়। এ দু সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বলে পান চাইলেন, ডিব্বা বাটুয়া কাঁহা হ্যায়? আখেরী পান খা লিয়া যায়ে।"

"পান ত মাওলানার বহু পুরাতন সাথী। তার ব্যাপারে এমন ফয়সালা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা জেলের পরেও কি এ তালাক জারী থাকবে? বল্লেন, না, এ তালাকে রাজয়ী মুগাল্লায নয়।"

"এতে সাইয়েদ নকী আলী এবং আরও অনেকে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন এবং মাওলানা মুসাফা করে অনির্দিষ্ট মিয়াদের কারাবাসের জন্য সশস্ত্র প্রহরীর মধ্যে জীপে রওয়ানা হন। (উক্ত পত্রিকা)"

এ কারাবাস বিশ মাস পর্যন্ত চলে। তারপর মাওলানা পুনরায় সে জীবনের দিকে ফিরে আসেন যার থেকে বলপূর্বক ৪ঠা অক্টোবরে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এ পূর্ণ কারাজীবনে মাওলানা যে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন তা যদি জানতে চান ত মাওলানার পত্রাদির নিম্ন উধৃতগুলো পড়ুন এবং মনে রাখবেন যে এ সব পত্র অনুবীক্ষণ দৃষ্টিদ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার পর বাইরে এসেছে। দৃশ্যত এ সাধারণ জিনিস। কিন্তু এ যদি প্রকৃতপক্ষে আপনার দৃষ্টিতে বিরাট গুরত্বপূর্ণ বিষয় হয় তাহলে এসব চিন্তাধারার মর্যাদা ও মূল্য আপনার হৃদয়ে বদ্ধমূল হবে যা এসব পত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। মাওলানা বলেন ঃ

"আজকাল আমার স্বাস্থ্য এতো ভালো যে এমনটি আমার বহু বছর ভাগ্যে হয়নি। ক্ষুধা বেড়েছে। এতো সুন্দর ঘুম আসে যে বিগত পনেরো বছর এমন সুন্দর ঘুম কখনো আসে নি। মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকারের পরিশ্রম পূর্বের থেকে বেশী করতে পারি। আগের থেকে এখন কম ক্লান্তিবোধ করি। তার কারণ এই যে, আজ সম্ভবতঃ দুনিয়ায় আমার চেয়ে অধিক সুখী ব্যক্তি আর কেউ নেই বল্লে অতিরঞ্জিত করা হবে না। সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে আমার কোন চিন্তা নেই। কারণ তাদেরকে খোদার উপর সপর্দ করে এসেছি। জাতির জন্যেও আমার কোন চিন্তা নেই। কারণ এ ব্যাপারে খোদার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব আমার উপর ছিল তা বর্তমান সরকার নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন। জামায়াত ও দাওয়াতে ইসলামীর কোন চিন্তাও আমার নেই। কারণ গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে দায়মুক্ত হয়েছি। এ বিষয়েও আমি শতকরা

একশ ভাগ বিশ্বাস রাখি যে, আমার জেলে থাকার কারণে এ কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরঞ্চ উল্টো ফায়দাই হবে। এরপর আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন যে আমার চেয়ে সুখী ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি আর কে হতে পারে। তারপর এখানে চিন্তা-ভাবনা গবেষণা এবং নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করার যে খোদা প্রদত্ত সুযোগ আমার হয়েছে এ এমন এক নিয়ামত যার কামনা আমি আমার বিরাট ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনে করতাম। এ নিয়ামত থেকে বহু ফায়দা লাভ করছি এবং এতে মগ্ন আছি।"

আর এক পত্রে বলেছেন ঃ

"আপনার সদ্য প্রেরিত পত্র পাঠে মনে হচ্ছে যে, আমাদের নজরবন্দীর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়াতে আপনাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। এ এমন কিছু নয় যার জন্যে আপনি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ উদ্বিগ্নতায় ভুগছেন। এখানে আমরা দেখছি যে এখানে শত শত আল্লাহ্‌র বান্দাহ এমন রয়েছে যারা ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে চুরি, ডাকাতি, খুন এবং অন্যান্য অপরাধ করেছে যার পরিণামে বছরের পর বছর কারাজীবন ভোগ করছে। বড়ো কষ্টে জীবন যাপন করছে। তাদের না কোন আরাম আছে আর না আখেরাতের জীবনের জন্যে কোন সান্ত্বনার সামগ্রী। প্রশ্ন এই যে, যদি মানুষ এ সব কিছু সাময়িক লাভ ও ভোগ বিলাসের জন্যে বরদাশ্‌ত করে চলতে পারে, তাহলে এ কি আমাদের শোভা পায় যে, যা কিছু আমরা আমাদের নফ্‌সের জন্যে নয় বরঞ্চ খোদা ও তার দ্বীনের জন্যে করেছি এবং যার জন্যে আমরা চিরন্তন জীবনে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখি তার পরিণামে মানুষের পক্ষ থেকে কোন প্রতিহিংসামূলক কর্মকান্ড ঠান্ডা মাথায় বরদাশ্‌ত করব না এবং যে সামান্য কষ্ট আমাদের হচ্ছে তার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ব? আমি ত মনে করি নফ্‌সের বান্দাহদের তুলনায় হক পন্থীদের যদি দুগুণ চতুর্গুণ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তাদের কপালে কোন বিষন্নতা দেখা দেয়া উচিত নয়।"

আপন চিকিৎসকের কাছে লিখিত পত্রে মাওলানা বলেন ঃ

"আপনার দ্বারা ভালোভাবে পরীক্ষার পর চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা কল্যাণকর হতে পারে। কিন্তু জানতে পারলাম যে আইনতঃ তার কোন সুযোগ নেই। একটি মাত্র পথ রয়েছে তা এই যে, বিশেষ অবস্থা হিসাবে সরকারের নিকট এ অনুগ্রহ ভিক্ষা করি যে, আমার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু জালেমের নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা নীতি বিরুদ্ধ। জীবন

দিতে পারি কিন্তু অনুগ্রহের আবেদন করতে পারি না। অতএব যতটুকু চিকিৎসা আপনি গায়েবানা করতে পারেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।"

বড়ো ভাইয়ের কাছে লিখিত পত্রে মাওলানা বলেন ঃ

"আগামীতে যখন আপনি আসেন, বড়ো ছেলে দুটোকে সাথে নিয়ে আসবেন। হাজী মিয়া আসতে চাইলে তাকেও। প্রথমে ছেলেদের আসতে এ জন্যে নিষেধ করেছিলাম যে, তাদের মনের উপর এখানকার পরিবেশের খারাপ প্রক্রিয়ার আশংকা ছিল। এখন চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তাদেরকে এ স্থান অবশ্যই দেখানো উচিত। এ আশ্চর্যের কিছু নয় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো বর্তমান প্রজন্ম থেকে অধিকতর বিকৃত ও পথভ্রষ্ট হবে। তার মুকাবেলায় এদেরকে হয়তো আমাদের চেয়ে বেশী সংগ্রাম করতে হবে। ভোগবিলাসের জন্যে সন্তানদের প্রতি পালন করতে চাই না। বরঞ্চ কল্যাণের খেদমত এবং অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাদের প্রতিপালন করতে চাই।"

ছেলেদের লিখছেন ঃ

"আমি তোমাদেরকে খোদার উপর সপর্দ করে সবর করেছি। আমি মনে করি তোমাদের সেভাবেই জীবন যাপন করা উচিত যেমন আমার মৃত্যুর পর করতে। এটাও আল্লাহ্‌র শান যে, তিনি আমার জীবদ্দশাই তোমাদেরকে সে অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিয়েছেন, যা অন্যান্যদের বেলায় তাদের অভিভাবকদের মৃত্যুর ফলে হয়ে থাকে। এ অভিজ্ঞতায় তোমরা ভীত হয়ো না। বরঞ্চ কল্যাণের সুযোগ গ্রহণ কর। ইনশা আল্লাহ্ এ তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে।"

মায়ের কাছে লিখিত পত্রে বলেন ঃ

"আমার বড়ো দুশ্চিন্তা ছিল যে আমার নজর বন্দির মেয়াদ বর্ধিত হওয়ার কারণে কি জানি আপনার স্বাস্থ্যের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়। এখন আপনার পত্রে এ কথা জানতে পেরে নিশ্চিন্ত হলাম যে আপনি তা অবিচলতাসহ বরদাশ্‌ত করেছেন যেমন একজন মুমেন মহিলার করা উচিত। বহু বছর যাবত যে পথে আমি চলছি এতে এ মন্‌যিল ত অবশ্যই আসার কথা। বিস্ময় তার আসার জন্যে নয় বরঞ্চ এতো বিলম্বে কেন এলো। প্রকৃত পক্ষে আমি বিস্মিত যে শয়তান ও তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আমাকে এতোদিন কি করে বরদাশ্‌ত করলো। যাহোক তারা যখন এদিকে মনোযোগী হয়েছে ত এখন আশা করবেন না যে এ সংঘাত তাড়াতাড়ি শেষ হবে। এখন এর সমাপ্তি এ ভাবেই হতে পারে। হয়

আমি খতম হয়ে যাব অথবা তাদের সংশোধন হবে যার জন্যে আমি বিগত পনেরো বছর যাবত কাজ করে আসছি। এ দুটি উপায় ছাড়া তৃতীয় কোন উপায় নেই। অতএব আমার মা, ভাই, বিবি, বাচ্চা, আমার সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন সব লোককে তাদের মন শক্ত করতে হবে এবং খারাপ অবস্থা থেকে অধিকতর খারাপ অবস্থার জন্যে তৈরী থাকা উচিত। আপনারা যদি এমন ভুল আশা পোষণ করেন যেমন বিগত ছ'মাস পোষণ করে থাকবেন, তাহলে বিনা কারণে আপনাদেরকে অপ্রত্যাশিত শোক দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করুন একটি অশুভ শক্তি দুনিয়াতে বড়ো জোর যা করতে পারে, আমি খোদার উপর ভরসা করে তা বরদাশ্‌ত করতে তৈরী আছি। অতএব যা কিছু হতে যাচ্ছে তা আমার কাছে তার চেয়ে কমই হচ্ছে যা আমি অনুমান করি। আমার ইচ্ছার উপর তার ততোটুকু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, একটি প্রস্তর খন্ডের উপর একটা মাছির আক্রমণে যা হয়ে থাকে। وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ।

নো'মানী সাহেব, আপনি এসব কি পড়ছেন? আপনি ঐ পথকে কি নামে স্মরণ করতে চান যে পথে মাওলানা মওদূদী চলছেন? আমার বিশ্বাস যদি আপনি তাওয়াককুল আলাল্লাহ্ এবং ইশ্‌ক ও জনুনের সে পথ সম্পর্কে অবহিত হন যে পথে আহলে হক ও আহলে সুন্নাত চলতে থাকেন, তাহলে আপনার এ কথা বলার সামান্যতম সাহসও হবে না যে মাওলানা মওদূদী দ্বীনের সেই বিভাগ (যার নাম তাসাওউফ) থেকে আকীদাহ্ ও আমলের দিক দিয়ে সরে আছেন এবং তার অভিজ্ঞতা সলুক ও তাসাওউফ থেকে দূরে রয়েছে। বরঞ্চ আপনাকে পরিষ্কার এ কথা বলতে হবে যে মাওলানা মওদূদী শুধু সালেকই নন বরঞ্চ হাজার হাজার সালেকের পথ প্রদর্শক।

মাওলানা মওদূদী তাঁর মুক্তির পর তর্জুমানুল কুরআনের শাবান থেকে যিলকদ ১৩৬৯ হিঃ সংখ্যাগুলোতে নিজের সম্পর্কে যে সব কথা বলেন, তা যদি মনোযোগ দিয়ে পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে একজন সূফীর ঈমান ও বিবেক কোন্ বস্তু হয়ে থাকে এবং কোন্ সে পথ যে পথে তিনি চলেন। এবং হাজার হাজার খোদার বান্দাহকে সে পথে টেনে নিয়ে আসেন। মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

"আমি আমার ৪৭ বছর বয়সের দু'তৃতীয়াংশ সময় অধ্যয়ন চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় কাটিয়েছি। এ ত্রিশ বছরে পড়ে, শুনে চিন্তা করে এবং পর্যবেক্ষণ ও

অভিজ্ঞতালাভ করে আমার মনের এক বিশেষ গঠন কাঠামো তৈরী হয়েছে। আমার জীবনের এক লক্ষ্য ঠিক হয়েছে। আমার চিন্তার এক বিশেষ ধরন এবং বিচার বিবেচনা করার এক বিশেষ পদ্ধতি কায়েম হয়েছে। আমি এক অভিমত পোষণ করি যার পেছনে রয়েছে বহু বছরের অধ্যয়ন জনিত যুক্তি প্রমাণ। আমি কিছু বিষয়কে সত্য বলে পেয়েছি এবং তার উপর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত মনে ঈমান এনেছি। কিছু বিষয়কে আমি বাতিল হিসাবে পেয়েছি এবং তা মনমস্তিষ্কের সম্মতিক্রমে গৃহীত ফয়সালার ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার মন ও বিবেকের এ সিদ্ধান্ত আমার ব্যক্তি জীবনেই তা সীমিত নেই, বরঞ্চ বহু বছর ধরে তার তবলীগও করছি। হাজার হাজার মানুষকে আমি ঐ লক্ষ্যের দিকে টেনে এনেছি যাকে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিলাম, হাজার হাজার লোককে এ হকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী বানিয়েছি যে হকের প্রতি আমি বিশ্বাসী। বাতিল থেকে হাজার হাজার মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছি যার সম্পর্ক আমি নিজে ছিন্ন করেছি। অসংখ্য খোদার বান্দাহকে হকের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের উচ্ছেদের লক্ষ্যে সংগ্রামে লিপ্ত করেছি যাতে আমি লিপ্ত রয়েছি। এখন যদি কেউ এ কথা মনে করে থাকে যে আমার মনমস্তিস্ক, চিন্তাধারা, জীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রতিটি বস্তুকে নিছক শক্তির দাপট এবং জেলের দলিল দিয়ে বদলানো যেতে পারবে, তাহলে আমি তাকে বলতে চাই যে, তার সঠিক স্থান পার্লামেন্টে নয় বরঞ্চ মানসিক রোগীর হাসপাতালে। সে যদি এরূপ আশা করে থাকে যে এ চাপের মুখে আমি আমার বিবেক তার কাছে বন্ধক রাখব এবং ভবিষ্যতে রেশন করা চিন্তা প্রকাশ করতে থাকব, তাহলে তাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, সে আমার চরিত্রকে তার আপন চরিত্রের উপর কিয়াস করার ভুল করেছে। আমার মন সত্যের জন্যে সব সময় মুক্ত আছে এবং আমার প্রতিটি অভিমত বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিবেকসম্মত দলিল দ্বারা বদলানো যেতে পারে। কিন্তু আমার ঈমান ও বিবেক কোন বিক্রয়যোগ্য বস্তু নয়। এর চেষ্টা পূর্বে যে করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে যে করবে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

মাওলানার মুক্তির পর ১৯৫১ সালের নবেম্বরে করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে প্রায় এক হাজার কর্মীকে মাওলানা কিছু গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দান করেন যার মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান এবং গর্ব অহংকার থেকে দূরে থাকার উপরে এতো সুন্দর ও সার্বিক আলোচনা করেন যা

তাঁর সাহিত্যে নজীরবিহীন। এসব এমন বিষয় যে সম্পর্কে সলুক ও তাসাওউফ প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করে। এ আলোচনায় মাওলানা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আখেরাতকে অগ্রাধিকার দানের উপর শুধু সঠিক ও মনোজ্ঞ আলোকপাতই করেন না, বরঞ্চ তা তৈরী করা, বিকশিত করা এবং তার তরবিয়াতের উপায় ও উপকরণও বলে দেন। সেই সাথে সত্যানুসন্ধীদের সামনে মানদন্ডও বিশদ ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেন। সুখের বিষয় মাওলানার এ অমূল্য ভাষণ শুধু তর্জুমানুল কুরআনেই প্রকাশিত হয়নি, বরঞ্চ "হেদায়েত" শীর্ষক পুস্তাকাকারেও প্রকাশিত হয়। এ ভাষণ থেকে সত্য পথ পিপাসু প্রত্যেক ব্যক্তি তেমন পরিমাণেই উপকৃত হতে পারেন, যেমন পরিমাণে তিনি একজন কামেল পীরের মৌখিক নসিহত অথবা তাঁর সাহচর্য লাভে উপকৃত হন। এ ভাষণ যিনি স্বয়ং পড়েছেন তিনিই অনুমান করতে পারেন যে, যে ব্যক্তির চিন্তাধারা ও অনুভূতির এ অবস্থা তাঁর বিরুদ্ধে তাসাওউফ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ এতো বড়ো যুলুম যে তা ধারণা করা যায়না। জানিনা এ ধরনের বানোয়াট অভিযোগ অপরের উপর আরোপ করে নিজের আখেরাত বরবাদ করার এতো শখ কেন?

উনিশশ' তিপ্পান্ন সালে মাওলানা ও গোটা জামায়াতের উপর যে অগ্নি পরীক্ষা আসে, তা জামায়াতের ইতিহাসে ত এক অতি কঠিন সময় ছিল। মাওলানাকে একেবারে ময়দান থেকে সরে দেয়ার যে যে ষড়যন্ত্র করা হয়, যে যে কূটকৌশল অবলম্বন করা হয়, যে যে রাজনৈতিক স্টান্ট্ ও ধর্মীয় ফেৎনা খাড়া করা হয় এবং যেভাবে বিক্ষোভ আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়, সেসব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক জামায়াতের ইতিহাসের সাথে অথবা মাওলানার জীবন চরিত্রের সাথে। আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে মাওলানার সীরাতের শুধু ঐ অধ্যায় সংক্ষেপে পেশ করব যা তাঁর মকামের পরিপূর্ণতা (কামালিয়াত) প্রকাশকারী।

তিনি তিপ্পান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসের তর্জুমানুল কুরআনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে বিশদ ভাবে এমন সব যুক্তি পেশ করেন যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ৩৩ জন নেতৃস্থানীয় আলেম কাদিয়ানীদেরকে একটি পৃথক সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। এ প্রবন্ধটি কাদিয়ানী সমস্যা শিরোনামে পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। বহু সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। তার পরই মাওলানাকে ২৮ ও ২৯শে মার্চের মধ্যবর্তী রাতে গ্রেফতার

করা হয়। রাতের শেষ প্রহরে যখন সশ্রস্ত্র পুলিশ মাওলানার বাসস্থান ও আপিস ঘেরাও করে তখন মাওলানা প্রস্তুতির জন্যে অন্দর মহলে যান এবং পুলিশ আপিস তল্লাসি করার কাজে লিপ্ত হয়। যখন মাওলানা আপিসে তশরিফ আনেন তখন এমন অবস্থায় যেন তিনি সফরে বেরুচ্ছেন। তাঁর কাগজপত্রের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে এ সম্পর্কে তিনি কোন পরোয়া করেন না। অর্থ সম্পাদক ভাবছিলেন যে মাওলানার নিকট থেকে সিন্দুকের চাবি সম্পর্কে কোন নির্দেশ লাভ করবেন যে চাবি কার হাতে দেয়া যায়। মাওলানা এ ব্যাপারেও কিছু করেন না এবং চাবি পুলিশের হস্তগত হয়। পুলিশ হিসাবের খাতা পত্রসহ নগদ দশ হাজার টাকা সিন্দুক থেকে বের করে নেয় এবং মাওলানাকে শাহী দুর্গে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁকে ২১৬ ঘন্টা একাকী রেখে বিভিন্ন ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং সকল কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ লোহার কলাই চিবানো যায়নি বলে তাঁকে খতম করার স্কীম তৈরী করা হয় এবং বলা হয় যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে যেনো তিনি তাঁর জবানবন্দী তৈরী করেন।

অতএব মাওলানা তাঁর জবানবন্দী তৈরী করে মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহীকে পড়তে দেন। তিনি বলেন, আমি যখন তা পড়লাম তখন অনুভব করলাম যে, মাওলানার ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাঁর প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা সম্পর্কে যখনই কোন আন্দাজ করতে গিয়েছি তা ধারণার অনেক বেশী পেয়েছি। এ জবানবন্দী দেখে এ ধারণা হচ্ছিল না যে এর প্রণেতা সবেমাত্র নিঃসংগ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং গত রাতেই এক কঠিন স্নায়ুযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। জবানবন্দীর ভাষায় না কোন রাগ, কোন উত্তেজনা, কোন কাঠিন্য ও কর্কশতা ছিল, বরঞ্চ সেই মর্যাদাপূর্ণ ধরন, গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রকাশভংগী, শক্তিশালী যুক্তি এবং স্থির ও ঠান্ডা মস্তিষ্কে যুক্তি প্রদর্শন। এমন মনে হচ্ছিল যে, জেলখানার চার দেয়ালের ভেতর নয় বরঞ্চ তাঁর লাইব্রেরীর শান্ত পরিবেশে বসে এ জবানবন্দী তৈরী করেছেন। সম্ভবতঃ এ ছিল সে প্রতিক্রিয়ারই ফল। তাই এ জবানবন্দী আমি যখন তাঁকে ফেরৎ দিতে গেলাম তখন কোলাকোলির সাথে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তাঁর হস্ত মোবারক চুম্বন করলাম যার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা কলমের সাহায্যে সত্য প্রকাশের বিস্ময়কর ক্ষমতা দিয়েছেন।

সামরিক আদালতে মাওলানার যে স্মরণীয় মামলা শুরু হয় যা কালেমায়ে হক সমুন্নত করার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং যা ইতিহাসে এমন এক গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা কিছুতেই ভুলে যাবে না।

বিজ্ঞ অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর লিখিত বয়ান মর্যাদাসহ পেশ করেন যেন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি নয় যে দাবী কৃত জবাব পেশ করছে, বরঞ্চ কোন জজ যিনি তারিখ মুতাবেক আদালতে কোন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর সুচিন্তিত রায় শুনিয়ে দিচ্ছেন। মামলার এক পর্যায়ে মাওলানার উকিল এরূপ পরামর্শ দেন ঃ "মাওলানা আপনি চাইলে এতোটুকু বলতে পারেন যে উমুক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অক্ষরে অক্ষরে সত্য হওয়া এবং আমার লেখা অনুযায়ী হওয়া জরুরী নয়। তারপর আমি স্বয়ং আলোচনা করতে পারব।"

কিন্তু সত্যের এ পতাকাবাহী উপরোক্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর আদালতে উক্ত সংবাদপত্র পেশ করে বিবৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মাওলানা দাঁড়িয়ে বলেন, হ্যাঁ, এ বিবৃতি আমার এবং আমি তার এক একটি শব্দের দায়িত্ব নিচ্ছি।

তিপ্পান্ন সালের ১১ই মে শুধু এ উপমহাদেশের জন্যে নয় বরঞ্চ ইসলামী বিশ্বের জন্যে একটি অশুভ দিন ছিল। এ দিন বাদ মাগরিব কাদিয়ানী সমস্যা নামে পুস্তিকা লেখার অপরাধে মাওলানাকে মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনানো হয়। এ শাস্তির পরিণামে এ 'ফানাফিল্লাহ' সূফীর উপরে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কোন প্রতিক্রিয়া হওয়াতো দূরের কথা, তাঁর কপাল ও মুখমন্ডলে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কবি মাহেরুল কাদেরী বলেন ঃ

یقینا اس تری جرات کو دنیا یاد رکھی گی
سزائی موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا

একিনান্ এসতেরী জুরায়াত কো দুনিয়া ইয়াদ রাক্ষেগী সাযায়ে মওত সুন্‌কর ভী না পেশানী পে বাল আয়া।

তোমার এ সাহসিকতা দুনিয়া অবশ্যই স্মরণ রাখবে। মৃত্যুদন্ড শুনার পরও কপালে কোন কুঞ্চন দেখা গেল না।

জেলের অফিসার মাওলানার হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বলেন, মাওলানা মৃত্যুদন্ডের ব্যাপারে আপনি চাইলে এক হপ্তার মধ্যে অনুকম্পার আবেদন করতে পারেন।

মওলানা বলেন, আপনারা একথা খেয়াল রাখবেন যে আমি কোন অপরাধ করি নি। আমি অনুকম্পার আবেদন করব না।

তারপর বলেন, আমার পক্ষ থেকে কেউ যেন আপিল না করে। না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার বিবি বাচ্চা, কেউ না। জামায়াতের লোকের

নিকটেও আমার এ আবেদন। তারপর মাওলনাকে ফাঁসির কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন করে সেখানকার বিশেষ পোষাক তাঁকে দেয়া হয়। তাঁকে যে পায়জামা দেয়া হয় তাতে ইজারবন্দ ছিল না। মাওলানা মনে করলেন, হয়তো ভুলে এমন করা হয়েছে। তাই তিনি ইজারাবন্দ দিতে বলেন। কিন্তু জানা গেল যে এখানে ইজারাবন্দ দেয়া হয় না। জীবনের আশা ত্যাগ করে কেউ হয়তো এর দ্বারা আত্মহত্যা করতে পারে। মাওলানা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন,

যে ব্যক্তির ভাগ্যে শাহাদাত লাভ হচ্ছে সে কি এতো নির্বোধ যে আত্মহত্যা করে হারাম মৃত্যু বরণ করবে?

কিন্তু আইন আইনই। সে জন্যে ইজারাবন্দ দেয়া হলো না। বাধ্য হয়ে তাঁকে সামনের দিকে দু'ধার টেনে গিট দিতে হলো। তবুও সতর ঢাকার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। নামাজ পড়তে বড়ো কষ্ট হতো। মাওলানার সমুদয় আসবাবপত্র নিয়ে নেয়া হলো এবং তাঁকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় রাখা হলো। অবশ্য এক খন্ড কুরআন পাক সঙ্গে ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর বান্দাহ দেখলেন যে তা মাটির উপর রাখা ব্যতীত কোনো স্থান নেই তখন তা ফেরৎ পাঠালেন। মাওলানা নিশ্চিন্তে খানা খেয়ে এশার নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফাঁসির কুঠরিগুলোতে বড়ো হৈ চৈ হচ্ছিল। কেউ সরকারকে উচ্চ শব্দে গালি দিচ্ছিল, কেউ উচ্চ স্বরে যিকির করছিল, কেউ দোয়া, কেউ কোন বুযর্গের সাহায্যের জন্যে কাকুতি মিনতি করছিল, কেউ কবিতা এবং কেউ গান গাইছিল। হট্টগোলে মাওলানা কখনো জেগে গেলেও পরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তেন।

পরদিন সকালে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর সুলতান আহ্মদ সাহেব, কতিপয় আপন সংগী সাথী ও মাওলানার বড়ো ছেলে ওমর ফারুক মওদূদীসহ মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর সুলতান সাহেব বলেন ঃ

মাওলানা, আপিল সম্পর্কে আমি আপনার নিকট থেকে কিছু শুনতে চাই। মাওলানা বলেন, ভাই, আমার মনোভাব তো আপনার জানা আছে। যারা আমার প্রকৃত অপরাধ ভালোভাবে জানে তাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করার চেয়ে আমি এর অধিক বরদাশ্ত করার যোগ্য যে আমার ফাঁসি কার্যকর হোক। এ আমার আত্মমর্যাদার খেলাপ। তারপর ক্ষমা চাইব কিসের জন্যে? এজন্যে কি

যে, আমাকে জান্নাতে কেন পাঠাচ্ছ? একথা ঠিক যে, সারা জীবন দ্বীনের খেদমত করেও অন্যভাবে মৃত্যু বরণ করে জান্নাতে যাওয়া ততোটা নিশ্চিত নয়, যেমন এ শাহাদাতের আকারে নিশ্চিত। তাহলে আমি কি বলবো, আমাকে জান্নাত থেকে বাচাঁও?

সুলতান সাহেব বলেন, মাওলানা। এতো আমারও জানা ছিল। কিন্তু আমার কথা এই যে, আমরা ইনসাফের অধিকার চাইব না কেন? তারপর আপিল ক্ষমার জন্যে নয়, বরঞ্চ আইনগত দফা ও মামলার অধিকারের ভিত্তিতে হবে। শেষ কথা এই যে, এ আপিল সেনা প্রধানের নিকটে যাবে এবং তিনি কোন দলীয় লোক নন। মাওলানা বলেন, আমার ধারণা এর কোন সুযোগই রাখা হয় নি। এজন্যে এভাবেই চলতে দিন। আমি দেখতে চাই যে, এ ভূখন্ডে কত বিবেক জীবিত। সুলতান সাহেব পুণরায় তাঁর কথা জোর দিয়ে বলেন, আপনি অন্ততঃ পক্ষে আমাদেরকে বাধা ত দেবেন না। এত আল্লাহর দেয়া সীমারেখা ত নয় যার বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করা যাবে না? কারাদন্ডের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপিল করা যায়। বিশেষ করে যখন এ এক বিরাট জুলুম।

মাওলানা জবাবে বলেন, ভাই একথা আমার পছন্দ হয় না। হুকুম দেয়ার ত অধিকারও আমার নেই। আমি চাই না যে.আমার পক্ষ থেকে, অথবা পরিবারের কারো পক্ষ থেকে, অথবা জামায়াতের ভেতর ও বাইরের কারো পক্ষ থেকে কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এমন কেউ করলে তাকে আমি মাফ করব না। স্বয়ং জামায়াতের কল্যাণ ও উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি আপিলের পক্ষে নই।

মাওলানাকে জিজ্ঞাস করা হলো, আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন নেইতো?

মাওলানা বলেন, চশমার খাপ ও কিছু খিলালের কাঠি দরকার। এ দু'টি তাঁকে দেয়া হলো। সাক্ষাতের সময় শেষ হলে মাওলানা ওমর ফারুক মিয়ার কাঁধে হাত রেখে সান্তনা দিয়ে বলেন,

বেটা, ঘাবড়ায়ো না। যদি আমার পররোয়ারদেগার আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নেয়া মনযুর করে থাকেন, তাহলে বান্দাহ্ সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আর যদি এর হুকুম হয়ে না থাকে, তাহলে এরা উল্টো ঝুলে পড়বে, আমাকে ঝুলাতে পারবে না। মিয়া মাহমূদ আলী কাসুরী সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি অনুকম্পা প্রার্থনার জন্যে নিজের খিদমত পেশ করার কথা বলেন। মাওলানা বলেন, আমার মন তো কিছুতেই এ কথা গ্রহণ করতে পারছে না।

মোটকথা তিন রাত-দু'দিন ফাঁসির কুঠরিতে অবস্থানের পর মাওলানার মৃত্যুদন্ড ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ডে পরিবর্তিত করা হলো। অবশেষে ২৮শে এপ্রিল ১৯৫৫ সালে সরকার তাঁকে মুক্তিদান করেন। এ ভাবে মাওলানা শাহীদুর্গ, সামরিক আদালত, নিঃসংগ কারাদন্ড, ফাঁসির কুঠরি ও সশ্রম কারাদন্ডের স্তরগুলো ইশ্কে ইলাহীসহ অতিক্রম করে দু'বছর একমাস পর মুক্ত দুনিয়ার আলো বাতাসে ফিরে আসেন।

আমি মাওলানা মন্যুর নোমানী ও তাঁর সমমনা লোকদের কিছু বলতে চাই না । কিন্তু আমি সমগ্র শিক্ষিত দুনিয়াকে এমন অন্ধ ও বধির কি করে মেনে নেব যে এ সব ঘটনার মধ্যে না তাসাওউফের একটি ঝলক দেখতে পায় আর না একটি শুনতে পায়? কুরআন বলে ঃ اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ শুনে রাখো, আল্লাহর যিকরের দ্বারা মন নিশ্চিন্ততার নিয়ামত লাভ করে। এখানে 'যিক্‌রুল্লাহর' অর্থ যদি 'আল্লাহু আল্লাহু' যিকরের ধ্বনী হয় যা রাতে নীরবতায় খান্‌কার নিভৃত কক্ষ থেকে শুনা যায়, তাহলে বলতে পারিযে মাওলানা জীবনভর এ ধরনের ধ্বনী কখনো বুলন্দ করেন নি। কিন্তু এ 'যিকরে ইলাহীর' অর্থ যদি এ হয় যে, আল্লাহর ইয়াদ দেলের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে এবং জিহ্বা তার ইয়াদে সিক্ত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে মাওলানা সব চেয়ে বড়ো যাকের এবং এরই বদৌলতে আল্লাহর দরবার থেকে তাঁর মনের পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ হয়েছে। যে কুরআনে যিকরুল্লাহর সুফল মানসিক নিশ্চিন্ততা বলা হয়েছে সে কুরআনের প্রতি মাওলানা এতো খানি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন যে, ফাঁসির কুঠরীতে শুধু মাটির মেঝেতে তা রাখা তিনি পছন্দ করেন নি। এ কাজের ধরন কি তায়াল্লুক বিল্লাহ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন পরিমন্ডলের সাথে সম্পর্কিত? ফকীর ও আহলুল্লাহগণ হামেশা নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে বেখেয়াল রয়েছেন। প্রয়োজনীয় বস্তুলাভের চেষ্টাতো অবশ্যই করেছেন। কিন্তু তার গোলাম হয়ে পড়েন নি কখনো। সামান্য প্রয়োজন পূরণ না হলে অস্থির হয়ে পড়েছেন এমন নয়। মাওলানা ফকীরি ও বেলায়েতের এ মর্যাদাই প্রদর্শন করেন। ফাঁসির কুঠরিতে তিনি খানা পিনা, লেবাস পোশাক প্রভৃতি কোন কিছুই চান নি। আইন অনুযায়ি যা কিছু পেতে পারতেন তা সবই তাঁকে দেয়া হতো। তিনি শুধু বল্লেন, চশ্‌মার খাপ এবং খিলালের কাঠি তাঁর দরকার। চশ্‌মার খাপ না হলে চশ্‌মা ভেঙ্গে গিয়ে পড়াশুনার ব্যাঘাত হতে

পারতো এবং খিলালের অভাবে দাঁত পরিষ্কারে বিঘ্ন ঘটতো। ফাঁসির কুঠরিতে অধ্যয়নের জন্যে সীরাতে ইসমাইল শহীদ (র) চেয়ে নিয়েছিলাম। সকলেরই জানা আছে যে মাওলানা ইসমাইল শহীদ (র) শুধু আহলে তাসাওইফেরই একজন ছিলেন না, বরঞ্চ এ পথের ঘোড় সওয়ার ছিলেন। স্বয়ং মাওলানা মন্‌যূর নোমানী তাঁর প্রবন্ধে ইসমাইল শহীদের 'সিরাতে মুস্তাকীম' গ্রন্থ্ সম্পর্কে বলেন, তাসাওউফ সম্পর্কে এ এক উচ্চমানের গ্রন্থ্। কিন্তু তিনি নিভৃতে বাসকারী সূফি ছিলেন না। বরঞ্চ মর্দে ময়দান সূফি ছিলেন। এ জন্যে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করে অমর হ'য়েছেন। এ ধরনের একজন মর্দে বুযর্গের সীরাত ফাঁসির কুঠরিতে সামনে রাখা মাওলানা মওদূদীর তাসাওউফ ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধারই প্রমাণ। অনুকম্পা লাভের আবেদন সম্পর্কে মাওলানার চিন্তাধারণা এবং ইজারবন্দ না পেয়ে ফাঁসির কুঠরিতে যে কথা তিনি বলেন তা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে মওতের তামান্না এবং ইসলামী আত্মমর্যাদার এ উচ্চমান এমন কোন ব্যক্তির হতে পারে না যে বাস্তবে "ইহসানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়।"

পঁচিশ মাস যাবত চরম অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে কালযাপন করার পর মাওলানা যখন তর্জুমানুল কুরআনের সম্পাদনার পূণরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যে চিন্তাধারা ও অনুভূতি প্রকাশ করেন তা একবার পড়ে দেখুন। তাহলে জানতে পারবেন যে, একজন আলোক উদ্ভাসিত বিবেক সম্পন্ন সূফী যখন অগ্নি পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চলেন, তখন তাঁর বিবেক কতটা আলোক লাভ করে এবং তাঁর ঈমান ও একীন কতটা মজবুত হয়।

মাওলানা বলেন-

"দীর্ঘকাল পর এ পৃষ্ঠাগুলোতে পূনরায় আমার চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ এসেছে। এ কালে আল্লাহ্ তায়ালার ফযল, তাঁর রহমত ও রবুবিয়তের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এ নগণ্য বান্দাহর শুকরিয়ার হক আদায় করার চেয়ে অনেক বেশী এবং এ বান্দাহর গোনাহ তার থেকে অনেকগুণ বেশী যে সে নিজেকে মালিকের অনুগ্রহ অনুকম্পার অধিকারী মনে করে। দোয়া এই যে, যে প্রভু এতো অনুগ্রহ করেছেন, তিনিই যেন তাঁর বান্দাহকে এতোটা তওফিক দান করেন যেনো ভবিষ্যতে সে তার অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করতে পারে এবং দ্বীনে হকের এমন কোন খেদমত করতে পারে যা আখেরাতে কবুল

হওয়ার যোগ্য হয়। আমার অন্তরংগ বন্ধু-বান্ধব এবং সকল শুভাকাংখী ভাইদের কাছেও আমার এ আবেদন যেনো আমার জন্যে এ জিনিসেরই দোয়া করেন।"

তিনি আরও বলেন,

"আমার নগণ্য খেদমতকে যাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, স্বভাবতই আমার অপ্রত্যাশিত মুক্তিতে তাঁরা অসাধারণ আনন্দ লাভ করেছেন। যে মহব্বত ও আন্তরিকতার সাথে এ আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে তার জন্যে আমি সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তাঁদেরকে প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। কারণ- আমার প্রতি তাঁদের মহব্বত কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের খাতিরে। আল্লাহ যেন আমাকে সে সুধারণার অধিকারী বানান, যে সুধারণা তাঁর বহু বান্দাহ আমার প্রতি রাখেন এবং আমাকে সে সব সুযোগ পূরণ করার তওফিক দেন- যা দ্বীনের হকের সঠিক খেদমতের জন্যে তিনি আমাকে দিয়েছেন।"

"সেই সাথে আমি এ আবেদন না করে পারছি না যে, বন্ধুদের আনন্দ প্রকাশে এবং মহব্বতের আবেগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোন কোন সময়ে এমন রীতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যাতে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় নি। তাঁদের নিষেধ করাও আমার জন্যে কঠিন। কারণ আধ্যাত্মিকতা ও বিনয়-নম্রতার প্রদর্শনী আমি পছন্দ করিনা এবং তা মেনে নেয়াও কঠিন। কারণ আমি মনে করি এ সব বিষয় ফেৎনা সৃষ্টি করতে পারে। কতই না ভালো হতো যদি আমার বন্ধুগণ অন্ততঃ আমার সম্পর্কে তাঁদের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে ভারসাম্যের সীমা থেকে কম করাই যথেষ্ট মনে করতেন।"

-(তর্জুমানুল কুরআন-খন্ড ৪৪, সংখ্যা-৪)

আমরা এখানে অতিরিক্ত আর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। তা এই যে দুনিয়াকে অবজ্ঞার চোখে দেখা এবং আখেরাতের আকাংখা তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। তো আশ্চার্যের ব্যাপার এই যে লোক একটু খেয়ালও করেনা যে মাওলানা মওদূদী এতো অধিক সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা তা যে উপমহাদেশের কম গ্রন্থকারই এ ব্যাপারে হয়তো তাঁর মুকাবেলা করতে পারেন। যদি মাওলানা এ সব গ্রন্থ থেকে স্বয়ং লাভবান হতে চাইতেন, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করতে পারতেন। কিন্তু দু' চার খানা কেতাব ছাড়া তাঁর সকল কেতাব জামায়াতকে দিয়েছেন এবং জামায়াতের বায়তুল মাল এ সব প্রকাশনার উপর নির্ভরশীল। মাওলানার অবস্থা এই যে তাঁর কোন বিষয় সম্পদ

নেই। কোন অর্থ এমনকি নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত নেই। তিনি এক ভাড়া করা বাড়িতে থাকেন। তামাশা এই যে, এ সব সত্ত্বেও তিনি সূফী নন। মনে হয়, সূফী হওয়ার জন্যে তার গুণাবলীর প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ কোথাও তালিকাভুক্ত (REGISTERED) হয়ে যাওয়া জরুরী। এরপর কোন ব্যক্তির মধ্যে তাসাওউফের গুণাবলীর কোন চিহ্ন পাওয়া না গেলেও সে সূফী।

আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ একথা ত চিন্তা করে দেখুন যে, মাওলানার মতো ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি যদি চাইতেন, তাহলে দুনিয়ার ভোগবিলাস, পার্থিব স্বার্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি লাভ করতে পারতেন, কিন্তু শুধু যে এর জন্যে কোন চেষ্টাই করেন নি, বরঞ্চ অনেক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছেন এবং এ ধরনের বহু প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে তিনি এতোটা দূরে অবস্থান করেছেন যে, হায়দরাবাদের মতো শহরে তিনি দশ বছর অবস্থান করেন, কিন্তু কোন চাকুরি গ্রহণের খেয়ালও করেন নি। তাঁর পত্রিকা তর্জুমানুল কুরআনের প্রচার ও প্রসারের জন্যে অথবা তার আর্থিক সাহায্যের জন্যে কোন নবাব বা ধনাঢ্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগও করেন নি। তর্জুমানুল কুরআনের কয়েকশ' সংখ্যার গ্রাহক হায়দরাবাদ সরকার একবার তা বন্ধ করে দেন। নবাব সাহেব চাচ্ছিলেন যে যদি মওদূদী সাহেব-স্বয়ং গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন, তাহলে পুণরায় তা চালু করা হবে। মাওলানা এ কথা জানতে পেরে বলেন, আমি কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজের জন্যে তাঁর কাছে যাবো না। ফলে তাঁকে চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তর্জুমানুল কুরআন থেকে লব্ধ অর্থ তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইতেন না। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সাথে একটি দাওয়াখানা কায়েম করেন।

হায়দরাবাদে অবস্থান কালে মাওলানা মানাযের আহসান সাহেব ইউনিভার্সিটিতে দীনিয়াত শিক্ষা দেয়ার জন্যে মাওলানার নাম পেশ করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী স্যার আকবর হায়দরীর সাথে কথা বলে কলেজে দীনিয়াতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে মাওলানার প্রতি আহবান জানান, মাওলানা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর কলেজের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক না পারলেও পার্টটাইম খেদমতের অনুরোধ করা হয়। মাওলানা তাও কবুল করতে রাজী হন নি। অবশেষে মাওলানা মানাযের আহসান সাহেবের অনুরোধে মাওলানার বড়ো ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদীও এ সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করে তাকে কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণে সম্মত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু

মাওলানা বলেন, আমি জাতির খেদমত করার মনস্থ করেছি। বড়ো ভাই তাঁকে এ ভাবে বুঝান, তুমি মুসলমানদের পরীক্ষা করে দেখেছ। মুহাম্মদ আলী জওহরের পরিণামও তোমার সামনে রয়েছে। মিঃ জিন্নাহ ও তোমার সামনে। মুহাম্মদ আলী জওহরের মধ্যে যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার অভাব ছিল না। যেহেতু তাঁর পকেট খালি ছিল সে জন্যে জাতি তাঁকে একদিকে হটিয়ে দেয়। অপর দিকে মিঃ জিন্নাহ ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহনের জন্যে জাতির মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এ জন্যে জাতি তাঁর ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করে নি। প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁর কথায় সাড়া দিয়েছে। তোমার পকেটও খালি। তুমি যাই করনা কেন, এটাই মনে করা হবে যে তুমি অর্থ উপায়ের জন্যে দাঁড়িয়েছো। এ অবস্থায় ন্যায়সংগত এই হবে যে তুমি কলেজের চাকুরী গ্রহণ কর। কলেজ তোমাকে উন্নতি দানের জন্যে প্রস্তুত। দু'এক বছরে তোমার কিছু অর্থ সঞ্চিত হবে। তারপর চাইলে তুমি রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে পারবে।

এ দীর্ঘ বক্তৃতার পর মাওলানা বলেন, এখন সময় আর নষ্ট করা যায় না। আমার বিশ্বাস, আমার দাওয়াতে যদি আন্তরিকতা থাকে আমার আবেগ বৃথা যাবে না। অবস্থা বড়োই নাজুক হয়ে পড়েছে। আমি দেখছি যে, প্লাবণ আসছে। তা ১৯৫৮ সালের ইংরেজ শাসনের প্লাবণ থেকে অনেক ভয়াবহ ও ধ্বংসকর হবে। মুসলমানদেরকে এ বিপদ থেকে সাবধান করে দেয়া আমার একান্ত ফরয। আমার সাধ্যমত তাদের খেদমত করার চেষ্টা করব।

তিনি কাজ শুরু করলেন এবং তাঁর কাংখিত মিশনের জন্যে হায়দরাবাদ শহর পরিত্যাগ করে এমন এক পল্লীর নিভৃত স্থানে গিয়ে উঠলেন যেখানে তাঁর বাসস্থান ছাড়া আর মাত্র দু'টি বাড়ি ছিল। পল্লী গ্রাম হওয়ার কারণে জীবনের বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। এমনকি অনেক সময়ে মাওলানাকে কূপ থেকে পানি উঠাতে ও রান্নার জন্যে জ্বালানী কাঠ ফাঁড়তেও হয়। তাঁর মতো লোকের দুনিয়া ও তার সামগ্রী তালাশের কোন প্রয়োজন ছিল না, দুনিয়ার সম্পদ তাঁর পায়ের তলায় গড়াগড়ি করেছে।

মাওলানা নোমানী সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি আপনি কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান রাখেন তাহলে কেন যুক্তি প্রমাণসহ সামনে আসছেন না এবং কেন বলছেন না যে, তাদের প্রোগ্রাম অমুক অমুক স্থানে কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী ও তাদের আমল ও শ্লোগান অমুক অমুক দিক দিয়ে কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী? আমি মনে করি এক সময়ে মাওলানা মওদূদী যা কিছু

বলেছিলেন তা এতোটা যথেষ্ট ছিল যে এর চেয়ে বেশী বলার প্রয়োজন নেই। মাওলানা প্রচলিত তাসাওউফের কিছু খারাপ দিক চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তসহ সুস্পষ্ট করে বলেন, আমরা চাই যে কোন প্রকারে তাসাওউফের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'ইখলাস লিল্লাহ' ও 'তাওয়াজ্জুহ্ ইলাল্লাহ' কে এমন পন্থায় হাসিল করা যাক যাতে ওসব দোষক্রটি থেকে মুক্ত হয়। এ উদ্দেশ্যে আমরা এ ওসব সূফীয়ানা পন্থা পদ্ধতি পরিহার করতে চাই যা আমাদের দৃষ্টিতে -দোষক্রটির কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে যেগুলোকে কোন সাহেবে ইল্‌ম সূফী মুবাহ থেকে অধিক মর্যাদা দেয়ার সাহস করতে পারেন না। তার স্থলে আমরা এ উদ্দেশ্যে এমন সব পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাই, যা অন্ততঃপক্ষে এ পর্যায়ে মুবাহ ত বটেই উপরন্তু আমরা এটাও প্রমাণ করতে প্রস্তুত যে আমরা এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাত অনুসরণ করেছি এবং এমন কোন একটি জিনিসও এমন অবলম্বন করিনি যা কুরআন ও সুন্নাতে পাওয়া যায় না। আমরা বুঝতে পারি না যে যদি প্রকৃত পক্ষে এ সব লোক সূফীয়ানা তরিকাগুলোকে নিছক কৌশল ও মুবাহর পর্যায়ে রাখেন এবং তা কমবেশী ও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার যোগ্য মনে করেন তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে কেন হৈ হল্লা সৃষ্টি করে রেখেছেন। বড়োজোর তাঁরা আমাদের সাথে মত পার্থক্য রাখতে পারেন। কিন্তু এ ফতোয়া বাজি ও ভর্ৎসনা তিরস্কার কেন?" (তর্জুমানুল কুরআন, খন্ড ৩৬, সংখ্যা- ৫-৬)

শেষকথা

শেষকথা হিসেবে বলতে চাই যে, 'তাজদীদ ও ইহ্ইয়ায়ে দ্বীন' গ্রন্থে তাসাওউফের বর্তমান কাঠামো থেকে সৃষ্ট বহু ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করে মাওলানা মওদূদী তা পরিত্যাজ্য গণ্য করেছেন এবং বলেছেন-

"এখন যাকেই 'তাজদীদ ও ইহ্ইয়ায়ে দ্বীনের' (ইসলামী রেনেসাঁ) জন্যে কোন কাজ করতে হয় তার জন্যে অপরিহার্য যে, তাসাওউফ চর্চাকারীদের ভাষা, পরিভাষা, মর্মকথা, ইশারা ইংগিত, লেবাস পোষাক, রীতিপদ্ধতি, পীরি মুরীদি এবং প্রতিটি সে বস্তু থেকে যা এ তরিকা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় মুসলমানদেরকে এমনভাবে দূরে রাখতে হবে যেমন ডায়বেটিস্ রোগীকে চিনি থেকে দূরে রাখা হয়।"

এ কথাগুলো মাওলানা কোন প্রকার চিন্তাভাবনা না করে নিছক ভাবাবেগে বলেননি, বরঞ্চ এ তাঁর অতি সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি স্বয়ং সারা জীবন মেনে চলেছেন। আপনি তাঁর হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার মধ্যে এমন একটি ছত্রও দেখাতে পারবেন না, আর না তাঁর কর্মপদ্ধতি থেকে এমন কিছু পেশ করতে পারবেন যা তাঁর উপরোক্ত অভিমতের পরিপন্থী। এখন অবুঝ জনসাধারণ ত এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারে যে মাওলানা 'তাসাওউফ' সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ এবং তার প্রতি তাঁর কোন অনুরাগই ছিলনা। কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যেও এ কথা মেনে নিতে পারি না যে শিক্ষিত লোক এবং বিশেষ করে যাঁরা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান রাখেন তাঁরা এ বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন যে মাওলানা আহলে হক ও আহলে সুন্নাতের গৃহীত তাসাওউফ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন তাসাওউফ কার্যকর করেছেন, অথবা তাসাওউফ সম্পর্কেই ছিলেন অজ্ঞ। আমি জানি ওলামায়ে দ্বীনের নজর জনসাধারণের মতো

নয়। জনসাধারণ ত বাহ্যিক দিকটা দেখে এবং ঢোলের উচ্চ শব্দ শুনতে অভ্যস্থ। তাদের কি মাথা ব্যথা যে ভেতরে কি আছে, কি নেই? কিন্তু নবীগণের ইল্‌মের ওয়ারিস ও কিতাব ও সুন্নাতের বাহকগণ ত কাঠামোর সাথে তার অভ্যন্তরস্থ রূহ্‌কেও দেখেন। এমন দৃষ্টির গভীরতা যার নেই এবং সে যদি এ দাবী করে, আমি শুধু ইল্‌মে যাহের নয়, ইল্‌মে বাতেনেরও অধিকারী, বরঞ্চ এ পথের প্রদর্শকও, তাহলে তার সকল কিছুর দাবী করা সত্ত্বেও সে একেবারে সাধারণ মানুষের পর্যায় ভুক্ত এবং বড়োই আত্মপ্রবঞ্চিত। তার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের মংগল এতেই রয়েছে যে সে যেন যত শীঘ্র সম্ভব আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসে এবং বস্তু সমূহের মর্মকথা ও তত্ত্ব দেখার দৃষ্টি পয়দা করে। সে যুগের একজন সাহেবে হাল সূফীর উপর আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য রহমত নাযিল করুন যিনি বড়ো সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

ایٔ اهل نظر ذوق نظر خوف هی لیکن-
جو شی کی حقیقت کونه دیکهے وه نظر کیا هی

আয় আহলে নজর যওকে নজর খুব হ্যায় লেকিন
জু শাই কি হাকীকত কো না দেখে ও নজর কিয়া হ্যায়?

হে দর্শক, দেখার ত বড়ো শখ তোমার, কিন্তু যে দেখা বস্তুর অন্তর্নিহিত মর্ম কথা দেখেনা, সে দেখা কেমন?

বড়ো দুঃখের কথা যে বর্তমান যুগের কত ওলামায়ে দ্বীন, যাঁরা সূফী হওয়ার গর্ব করেন এবং অপরকে সূফী না হওয়ার জন্যে ভর্ৎসনা করেন, তাঁরা একেবারে সেই আত্মপ্রবঞ্চার শিকার। তাঁরা দুনিয়াতে যখন এতোটা অন্ধ, তাহলে তাঁরা কি আশা করতে পারেন যে আখেরাতে কোন দৃষ্টিশক্তি লাভ করবেন?

মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আপনি তাঁর এক একটি কথা ও কাজ দেখুন এবং বহিরাবরণ উল্টিয়ে দেখুন তাহলে এটাই দেখতে পাবেন যে এ সব ত সেই হকীকত ও মা'রেফৎ যা ইহসান ও তাসাওউফ নামে অভিহিত এবং সে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যার দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার কারণে আহলে হক ও আহলে সুন্নাত হামেশা দ্বীনে হকের সাচ্চা খাদেম প্রমাণিত হতে থাকেন। এ বস্তু কেন আপনার দৃষ্টিকে এদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যে মাওলানা "পীর ও মুরীদের" স্থলে "আমীর ও মামুর", "খলিফার" স্থলে "নায়েব", "বয়আতের" স্থলে "এতায়াতে আমর", "খানকার" স্থলে "তরবিয়ত

গাহ", "সিলসিলায়" প্রবেশ করার স্থলে "আন্দোলনে যোগদান" ও "জামায়াতে শামিল হওয়া", "মুরাকাবার" স্থলে "তাফাককর ও তাদাববর", "মুজাহাদা ও রিয়াযতের" স্থলে "সংগ্রাম, কুরবানী ও জীবন বিলিয়ে দেয়া", প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করছেন? সলুকের পথের পরিবর্তে এক নং, ২ নং, ৩ নং রুকন বলছেন। "আল্লাহর উপর নির্ভরশীলদেরকে" সার্বক্ষণিক কর্মী" নামে অভিহিত করেন? এ ভাবে তাসাওউফে প্রচলিত বহু পরিভাষা তিনি ভিন্ন শব্দে পরিবর্তন করেন।

কিন্তু আপনি কি চিন্তা করে দেখছেন না যে, নবীর সে যুগে, সাহাবীগণের যুগে এবং তাবেঈনের যুগে, বিশেষ করে প্রথম যুগের সূফীয়ায়ে কেরামের যুগে এসব পরিভাষার কোন নাম নিশানা ছিল না? তাহলে আপনার চিন্তার বিভ্রান্তির বুনিয়াদ কি? বিভিন্ন স্তর বা মর্যাদা নির্ধারণে এবং হাকীকত অনুধাবণে এ জিনিসই কি আপনার দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক যে মাওলানা মওদূদী কাশ্‌ফ ও কেরামতের সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও তা শুধু দূরদৃষ্টি এবং শরিয়ত মেনে চলার অনিবার্য পরিণাম ফলের আকারে প্রকাশ করেন? আপনি কি তাঁর সে পত্র পড়েন নি যা তিনি হায়দরাবাদের পতনের প্রায় এক বছর পূর্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকটে পাঠিয়েছিলেন? হায়দরাবাদে কি দুরবস্থা হতে যাচ্ছে এবং এর পরিণাম কি হবে তা এতো বিশদ ভাবে পত্রে বর্ণনা করেন যেন কোন ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখে পূর্ণ নিশ্চয়তাসহ বলছে যে, অমুক দলের আচরণ কি হবে, অমুক ব্যক্তি কি করবে, অমুক অমুক দল ও শ্রেণীকে অমুক অমুক বিপদে পড়তে হবে এবং তার পর এটা হবে, ওটা হবে। তারপর এ পত্রখানা শুধু ভবিষ্যদ্বানীরই রূপ ধারণ করতো না, বরঞ্চ এর মধ্যে পরামর্শও ছিল যে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্যে কি করা প্রয়োজন এবং কিভাবে করতে হবে। যাঁদের নিকটে পত্র লেখা হয়েছিল তাঁদের এ সব কথার উপর বিশ্বাস করা ত দূরের কথা তার ধারণাও ছিল না। কিন্তু একজন আল্লাহওয়ালার পুরোপুরি সাবধান করে দেয়া এবং সংশোধনের জন্যে অযাচিত পরামর্শ দেয়া সত্ত্বেও তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। সবশেষে তাই হলো যা একব্যক্তি বলেছিলেন এবং অত্যন্ত দরদ ও দুঃখের সাথে বলেছিলেন। হায়দরাবাদের পতনের পর এ পত্রখানা 'মাসিক আনওয়ার' (হায়দরাবাদ) জুলাই ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তা পাঠ করার পর কেউ অশ্রু বিসর্জন না করে পারে নি। এ পত্রিকাটি সীমিত সংখ্যায় প্রকাশিত হতো বিধায় অনেকের সে পত্র পাঠের সুযোগ হয় নি। কিন্তু আপনি

মাওলানা মওদূদীর সে ভাষণও কি পড়েন নি, যা তিনি ভারত বিভাগের চার মাস পূর্বে মাদ্রাজ সম্মেলনে দিয়েছিলেন ? এ ভাষণ জামায়াতের কার্যবিবরণীর পঞ্চম খন্ডে এবং পৃথক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়-যার শিরোনাম ছিল 'ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী' এ ভাষণে ভারত বিভাগের পর কোন্ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তার বিশদ বিবরণ কি ছিল না? আজ ভারতের কোন মুসলমান কি এ কথা বলতে পারবে যে তারা কি সে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন নয়-যার খবর বহু পূর্বেই কি এক আল্লাহওয়ালা দিয়েছিলেন না?

ভারত বিভাগের সময় যখন "দারুল ইসলাম" পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে এবং দারুল ইসলামের চারদিকে এক মাইল পর্যন্ত হত্যাকান্ড লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি দুর্ঘটনা দিনরাত সংঘটিত হচ্ছিল, তখন এমন সে কোন্ জিনিস ছিল যা দুবৃর্ত্তদেরকে এ দিকে অগ্রসর হতে বাধাদিচ্ছিল? অথচ দারুল ইসলাম বস্তির জনসংখ্যা ছিল মাত্র বিশজন। এখান থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত পাঠানকোট শহর মুসলমানশূণ্য হয়ে পড়েছিল। পাঠানকোট রেলওয়ে ষ্টেশনের বাইরে মুক্ত মাঠে তাদেরকে ভেড়া-ছাগলের মতো একত্র করে রাখা হয়েছিল। এমনকি দারুল ইসলাম বস্তির একজনকে হত্যাও করা হয়েছিল। দারুল ইসলামের বাইরে এমন অবস্থা বিরাজ করছিল যে দারুল ইসলামের বাসিন্দাগণ চিন্তাও করতে পারতো না যে এখানকার নারীপুরুষের মধ্যে কোন একজন বেঁচে থাকবে। কিন্তু কি ব্যাপার যে, যে অতিক্ষুদ্র মুসলিম বস্তির লোক দিবারাত্র নিজের জীবন বিপন্ন করে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার জন্যে আপন এলাকায় চূড়ান্ত চেষ্টাও করেছিল, সে বস্তির দিকে সন্ত্রাসীদের কোন দল অগ্রসর হওয়ার সাহস করে নি, বরঞ্চ বিপরীত পক্ষে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার এমন পরিবেশ ছিল যে, হাজার হাজার নিঃস্ব মুসলমান এখানে আশ্রয় গ্রহণের জন্যে একত্র হয়। আড়াই হাজার লোকের দেখা শুনা করার, আহারাদির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বিশজনের উপর অর্পিত হয়। এক একজন, দুই দুইজন করে অস্ত্রহীন অবস্থায় আশ্রয় প্রার্থীদের সাথে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামানপত্র সেখান থেকে বহন করে আনতো। যে আবদুর রহমান সাহেব দারুল ইসলামের বাইরে শহীদ হন, তিনিও আশ্রয়প্রার্থী মেয়েলোকদের বাড়ি থেকে তাদের আসবাবপত্র আনতে গিয়েছিলেন।

কোনো আল্লাহর বান্দাহ বলুন যে খোদার ফজল ও করম এখানে যে অবস্থা

সৃষ্টি করে রেখেছিল তা কি ছিল এবং তা কোন্ নামে স্মরণ করা যেতে পারে?

শেষ কথা এই যে, যদি মাওলানা মওদূদী স্বয়ং তাঁর লেখা, বক্তৃতা ও তাঁর আপন কর্মপদ্ধতি সূফীগণের পরিচিত ভাষা ও প্রচলিত কর্মপদ্ধতি থেকে পৃথক রাখার চেষ্টা করেন অথবা মাওলানার সহকর্মীগণ যদি তা সেই রং ও রূপে পেশ না করেন যা সূফীগণ করে থাকেন তাহলে তার অর্থ এ কি করে হতে পারে যে মাওলানা "সূফী" নন। তিনি শুধু এ পথের পথিকই নন, বরঞ্চ আল্লাহর খাস রহমতে পরিপূর্ণ রাহ্বর এবং তাঁর ফয়েযের হালকায় ইসলামী ও পাশ্চাত্য জগতের লক্ষ কোটি মানুষ শামিল রয়েছেন। এ কথাগুলো যখন লেখা হচ্ছে ঠিক সে সময়ে 'তায্কিয়ায়ে নফ্স' সম্পর্কিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর পক্ষ থেকে তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হচ্ছে। খোদা করুন এ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি লেখা সমাপ্ত হোক এবং এর দ্বারা খোদার বান্দাহগণ উপকৃত হোন।

যদিও ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব নেই, কিন্তু ইচ্ছা করেই আমি তাসাওউফ ও মাওলানা সম্পর্কে যা কিছু লিখেছি তা সবটুকু রেকর্ডভুক্ত করা আছে যাতে পাঠক ইচ্ছা করলে সে রেকর্ড থেকে আমার প্রতিক্রিয়া সত্যায়ণ করতে পারেন এবং তাঁর মনে যেন সন্দেহের লেশটুকু না থাকে।

সমাপ্ত

মাওলানা মওদূদী ও তাসাউফ

মাওলানা আবু মনযূর শায়খ আহমদ